ঘোষ চৌধুরির ঘড়ি

অগ্রজকল্প

শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু



ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌

প্রণীত

রামধনু-কার্য্যালয়

১৬নং টাউনসেণ্ড্‌ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

দাম বার আনা

তা ডাফ্ ষ্ট্রীট্ যেমনই হউক না কেন, এ রাস্তাটির এতখানি বিশদ বিবরণ দিবার আমার কোনই প্রয়োজন হইত না, যদি না বিখ্যাত জাপানী অপরাধ-তত্ত্ববিদ্ ও ডিটেক্‌টিভ্ হুকা-কাশি আসিয়া এখানে বাসা না বাঁধিতেন।

বাড়ীটী আড়ম্বরশূন্য কিন্তু তবুও যেন তাহাতে কেমন একটা সৌন্দর্য্য জড়ান আছে। এই বাড়ীরই সাম্‌নের বসিবার ঘরটাতে সেদিন সকাল প্রায় সাড়ে আটটা-ন'টার সময় হুকা-কাশি বসিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে-ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ যে যুবকটী আসিয়া সেখানে ঢুকিল বাংলা দেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে তাহার নামের সহিত পরিচিত। সে হইতেছে দেশ-প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় রণজিৎ।

"খুব খবরের কাগজে মেতে আছেন যে দেখ্‌ছি, মিষ্টার হুকা-কাশি! বলি নতুন খবর-টবর কিছু আছে, নাকি সেই মান্ধাতার আমলেরই পুরানো বুলি ?"

"নতুন, বলে নতুন, একেবারে আন্‌কোরা নতুন—প্রোফেসার জি, গুপ্ত নাকি হঠাৎ কাল পাগল হয়ে গেছেন!"

"কে ? প্রোফেসার গঙ্গাধর গুপ্ত ? বলেন কি ?"

বলিয়া বিস্মিত রণজিৎ একেবারে ছোঁ মারিয়া হুকা-কাশির হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া লইল, এবং এক মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া যে পাতায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হেডিংয়ের নীচে সমস্ত ঘটনাটা লেখা ছিল সেই পাতাটীর ভিতর আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

সত্যিই তাই—অন্ততঃ খবরের কাগজ তাহাই লিখিতেছে। বিশ্ব-বিখ্যাত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক প্রোফেসার গঙ্গাধর গুপ্ত, যিনি তাঁর নূতন নূতন আবিষ্কারে সমস্ত সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছেন, যাঁর মুখের দিকে ভারতের সমস্ত শিক্ষিত-সমাজ সাগ্রহে চাহিয়া আছে, কাল সকালে তাঁর ল্যাবোরেটারীতে কি ঘটিয়াছে কেহই জানে না, কিন্তু সমস্ত বাহ্যজ্ঞান তাঁর লোপ পাইয়া গেছে! বছর খানেক যাবৎ প্রোফেসার গুপ্ত নাকি কি একটা জটিল গবেষণায় মগ্ন ছিলেন; তাঁর সে গবেষণা সফল হইলে গোটা বিজ্ঞান-জগতে যে একটা মস্ত বড় ওলোট্-পালট্ হইয়া যাইবে, এই ধরণের একটা কাণা-ঘুষাও শোনা যাইতেছিল—কিন্তু কী যে সে গবেষণাটা আজ পর্য্যন্ত কেহই তা টের পায় নাই, এমন কি তাঁর ল্যাবোরে-টারীর তত্ত্বাবধায়ক বিরূপাক্ষ আচার্য্য পর্য্যন্ত নয়! দুর্ঘটনাটা ঘটিয়াছে গতকল্য। কাল সকালে তাঁকে খুবই প্রফুল্ল

দেখাইতেছিল। রোজকার অভ্যাস মত প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া তিনি তাঁর ল্যাবোরেটারীতে গিয়া কাজে বসিয়াছিলেন, তখনও কাক-পক্ষী জাগে নাই। বেলা সাড়ে সাতটায় চা খাইবার ডাক পড়ে, তিনি দোতালায় চা খাইতে চলিয়া আসেন। তখন পর্য্যন্ত কোনরূপ অস্বস্তির ভাবই তাঁর ভিতর দেখা যায় নাই। চা পানের পর আবার তিনি ল্যাবোরেটারীতে নামিয়া আসেন। খানিকটা বাদে ভিতর হইতে কেমন একটা কাতর শব্দ আসিতে চাকরেরা তাড়াতাড়ি ঘরে ছুটিয়া আসিয়া দেখে দুই হাতে মাথা চাপিয়া তিনি টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন—সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বড় ছেলেকে সংবাদ দিয়া ডাকিয়া আনা হয় এবং একটু পরে বিরূপাক্ষ আচার্য্যও আসিয়া জোটেন। কলিকাতা সহর উজাড় করিয়া বড় বড় ডাক্তারদের আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে কিন্তু প্রোফেসার গুপ্ত সেই যে একবার বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন এখন পর্য্যন্ত আর তাহা ফিরিয়া পান নাই; কাণ্ড-জ্ঞানহীন উন্মাদের মত যাহা মুখে আসিতেছে অনর্গল তাহাই নাকি বকিয়া যাইতেছেন।

রণজিৎ কাগজ পড়া শেষ করিয়া অসহিষ্ণুভাবে সেখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে দিতে কহিল, "এ

নিশ্চয়ই অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনার ফল—না হয়েই যায় না।”

টেবিলের উপর ঠিক সাম্‌নেই নস্যদানটা পড়িয়াছিল, হুকা-কাশি সেটা হইতে বেশ ধীরে সুস্থে এক টিপ্‌ নস্য লইলেন; তার পর রণজিৎকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “দেখুন রণজিৎ বাবু, এ জগতে কি যে কিসের ফল, এবং কি যে কিসের ফল নয় তা সঠিক বলা বড়ই কঠিন কাজ। ধরুন প্রোফেসার গুপ্তেরই এই ব্যাপারটা। আপাত-দৃষ্টিতে এটা তো এখন খুবই সোজা নিরামিষ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে—কিন্তু এমন হওয়াও আশ্চর্য্য নয় যে কোন্‌ দিন হয় তো শুন্‌বেন এরই ভেতর একটা মস্ত বড় রহস্য রয়ে গেছে।...” কথা কয়টী উচ্চারণ করিয়াই হুকা-কাশি থামিয়া গেলেন। সম্মুখের জানালা দিয়া রাস্তার কতকটা অংশ নজরে আসিতেছিল, দেখা গেল প্রকাণ্ড একখানা মিনার্ভা মোটর-কার আসিয়া এই বাড়ীরই সাম্‌নে দাঁড়াইয়া পড়িল।

একটু পরেই বেহারা অমৃত আসিয়া হুকা-কাশির হাতে একখানা কার্ড্‌ দিল। কার্ডে বাঁকা বাঁকা ইংরাজী হরফে যা লেখা ছিল সেটাকে বাংলা করিলে দাঁড়ায় এই—

ভূপেশনাথ ঘোষ চৌধুরী,

জমিদার, নলকোপা।

আগন্তুককে ভিতরে লইয়া আসিতে হুকা-কাশি আদেশ দিলেন। মুহূর্ত্ত পরে বেহারার পেছন পেছন যে ভদ্র-লোকটী ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন, তাঁর বয়স চল্লিশের উপরে উঠিয়াছে—প্রৌঢ় তাঁহাকে অনায়াসে বলা চলে। ঘরে ঢুকিয়াই তিনি ছোট্ট একটু নমস্কার করিয়া টেবিলের পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। হুকা-কাশি প্রতি-নমস্কার কবিয়া জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন, "মশায়ের নাম অনেক দিন থেকেই জানা আছে, শুধু সুযোগের অভাবেই এদ্দিন পরিচয় হয়নি। কিন্তু কাল রাত্তিরে আমার বাড়ীতে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে সে সুযোগ জুটিয়ে দিয়েছে এবং আজ তাই সকাল হতে-না-হতেই আপনার দো'রে ছুটে এসেছি। কথাটা একটু গোপনীয়" বলিয়া তিনি রণজিতের দিকে একবার তাকাইলেন।

রণজিৎ বুঝিল, ভদ্রলোক প্রকারান্তরে তাহাকে উঠিয়া যাইতে বলিতেছেন। সে গা-মোড়া দিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল কিন্তু হুকা-কাশি তার কাঁধে চাপ দিয়া তাকে বসাইয়া দিতে দিতে ভদ্রলোকটীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ইনি আমার পরম বন্ধু এবং বিশেষ স্নেহের পাত্র! আপনার যা কিছু গোপনীয় কথা আমার কাছে বল্‌বা

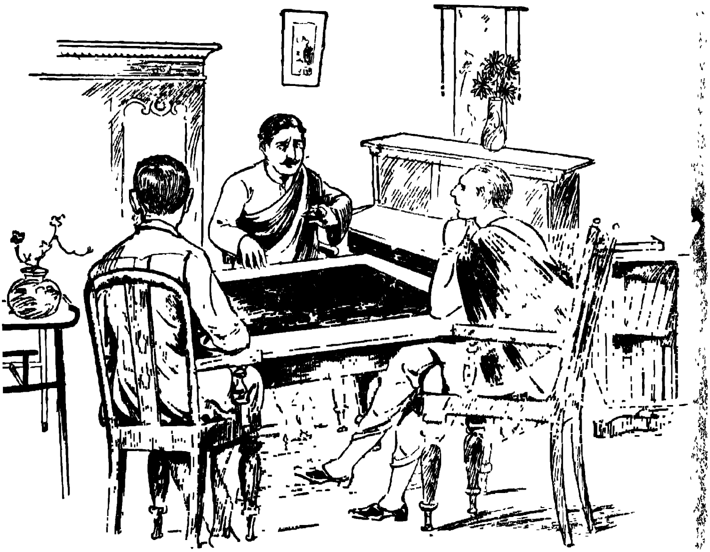
আছে তা স্বচ্ছন্দে এঁর সাম্‌নে বল্‌তে পারেন; তাতে এতটুকু ইতস্ততঃ কর্‌বার নেই।”

ভদ্রলোকটী বলিলেন, “আচ্ছা।” বলিয়াই কিন্তু আবার একটুকাল মাটীর দিকে তাকাইয়া চুপ্‌ করিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করিলেন :—

“একটু আগে যে আপনাকে একখানা ভিজিটিং কার্ড্‌ পাঠিয়েছিলাম, তা থেকেই বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছেন যে আমাদের বাড়ী নলকোপা—আমরাই সেখানকার ঘোষ-চৌধুরী বংশ। অবশ্য আমার নিজের কথা ধর্‌তে গেলে বল্‌তে হবে এক রকম ছেলেবেলা থেকেই আমি এই কল্‌কাতা সহরে মানুষ। আমাকে নিতান্ত বালক অবস্থায় রেখে আমার বাবা বেঘোরে মারা যান, সেই হ’তে মামার তত্ত্বাবধানে এখানেই আমাদের বাস,—শিক্ষা-দিক্ষা যা কিছু সমস্তই এখানে।

“বোধ হয় জানেন, জমীদারদের ‘কুণো’ বলে বরাবরই ভারী একটা অপবাদ আছে। কি থেকে যে এ অপবাদের সৃষ্টি হয়েছে তা অবশ্য আমার জানা নেই, তবে এটা ঠিক যে এ অপবাদটা যারা দিয়েছিল তারা যদি আমার বাবাকে একবারটী চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌ত তবে তাদের ধারণা একেবারে

উল্টে যেত। ঘরের কোণে বাবা এক মুহূর্ত্ত বসে থাক্‌তে পার্‌তেন না—তাঁর স্বভাবই ছিল গোটা দুনিয়াটা চষে ঘুরে বেড়ান। সভ্যজগতের এমন খুব কম দেশেরই নাম কর্‌তে পার্‌বেন যেখানে তিনি একবার-না-একবার না গেছ্‌লেন।



মশায়ের নাম……জানা আছে।

অমন যে আপনাদের দুরন্ত পীত সাগর, তাই পেরিয়ে জাপানেই বোধ করি গেছ্‌লেন কম করে বার দু'তিন। এই জাপানেরই পথে একবার বিপদ্‌ ঘট্‌ল! সিঙ্গাপুর থেকে

তার পাওয়া গেল—অসুখ হয়েছে। ব্যস্, দু'দিন যেতে-না-যেতেই খবর এল—সব শেষ !

"বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন ডাকে ছোট্ট একটা পার্শেল এল। খুলে দেখা গেল—সেটা পাঠিয়েছেন বাবারই এক বন্ধু, শেষ সমুদ্রযাত্রায় তিনি তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। পার্শেলের সঙ্গে একটা চিঠিও পাওয়া গেল। তাতে যা লেখা ছিল তার সার কথা এই যে, বাবার মৃত্যুর সময় তাঁর শেষ-চিহ্নস্বরূপ আর কিছু রাখা সম্ভব হয় নি, শুধু তাঁর ট্যাঁক্-ঘড়িটা বাদে। মৃত্যু-সময়কার চিহ্ন ব'লে হয়তো সেটা আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান্ বলে মনে হবে এই বিশ্বাসে সেটা তিনি পার্শেল করে পাঠালেন।

"ঘড়িটা এমন কিছু দামী বস্তু নয়, বরং ঠিক তার উল্‌টো—নিতান্ত সাধারণ। বাবা বরাবরই মোটা চালের মানুষ ছিলেন, বিলাসিতা জিনিষটাকে আদবেই বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌তেন না। রেলের গার্ড্ সাহেবদের ঘড়ির মত এত বড় ঘড়িটা ; কিন্‌তে হয়তো বাবার টাকা পঁচিশ-ত্রিশ লেগেছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আজ এই পঁয়ত্রিশ বছর পরে সেটাকে কেউ বিক্রী কর্‌তে গেলে দাম যে তার তিন চার টাকার বেশী উঠ্‌বে না, এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু তবুও

আমার চোখে তার দাম তিন চার লাখ টাকা—সেটা যে আমার স্বর্গগত পিতার শেষ-চিহ্ন, তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত তিনি যে সেটা প'রে ছিলেন!

"বহুমূল্য ধন-দৌলতের মতই যত্নে ঘড়িটাকে আমি এতদিন রক্ষা করে আস্‌ছিলাম। মূল্যবান্ সামগ্রীর সঙ্গে সেটা আমার লোহার সিন্দুকে বন্ধ থাক্‌তো, অবশ্য মাঝে-মাঝে বার যে করা হ'ত না তাও নয়; কাল রাত্রে আমার শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের একটা ড্রয়ারে সেটা ছিল। শুধু ঘড়িটাই ছিল না, প্রায় হাজার-খানেক টাকার গয়নাও সেই সঙ্গে দেরাজের ভেতর ছিল। অনেক রাত হয়ে গেছ্‌ল ব'লে আর লোহার সিন্দুক খোলার হাঙ্গামা করা হয়নি— ঠিক ছিল আজ প্রাতেই সেগুলিকে আবার জায়গা মত রাখা হবে। কিন্তু আজ ভোরে উঠে যা দেখা গেছে তা যেম্‌নি বিস্ময়কর, তেম্‌নি অদ্ভুত—ড্রয়ারের ভেতর সেই দামী গয়না-গুলো যেমনটী ছিল ঠিক্ তেমনটীই আছে, তার এতটুকু নড়চড় হয়নি, কিন্তু কে যেন তার মাঝে থেকে আস্তে ঘড়িটী তুলে নিয়ে গেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম বোধ হয় আমারই মনের ভুল, ঘড়িটাকে হয়ত আর কোথাও রেখেছি। একটু এদিক-সেদিক্ কর্‌তেই কিন্তু ঘরের অবস্থাটা ভাল ক'রে

নজরে এল, বুঝ্‌লাম কাল রাত্রে ঘরে চোর ঢুকেছিল সে সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অনুসন্ধানে কিন্তু দেখা গেল শুধু ঘড়িটাই খোয়া গেছে, আর যা কিছু জিনিষপত্র যেখানে যেমন ছিল তেম্‌নি আছে।

"ব্যাপারটা তখন আমাদের কাছে কি রকম আশ্চর্য্য ঠেক্‌ল তা আপনি সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন। হাতের ঠিক সম্মুখে হাজার-খানেক টাকার গয়না, অথচ চোর তা স্পর্শও করে নি; তা না করে করেছে কি—বছর চল্লিশের পুরোনো একটা দু'তিন টাকা দামের বাজে-মার্কা ঘড়ি নিয়ে সট্‌কে পড়েছে। কিন্তু বিস্ময় আমার একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছল, যখন একটু বাদেই আমার বড় ছেলে বাড়ীর সাম্‌নেকার বাগান থেকে ঘড়িটাকে ভাঙ্গা অবস্থায় খুঁজে বার কর্‌লে। চোর সেটাকে বাগানে ভেঙ্গে ফেলে রেখে গেছে।

"সেই থেকে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কেবলই ভাব্‌ছি চোরের এই অদ্ভুত ব্যবহারের মানে কি! হাজার টাকার গয়না ফেলে একটা পুরোনো অকেজো ঘড়ি চুরি করাও যেম্‌নি অদ্ভুত, মিছেমিছি সে ঘড়িটাকে ভাঙ্গা অবস্থাতে বাগানে ফেলে রেখে যাওয়াও তেম্‌নি আশ্চর্য্য! এ যেন পাগলের কাণ্ড! ভেবে ভেবে আমি

এর কিছুই কূল-কিনারা কর্‌তে পার্‌ছি না; আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং আশ্চর্য্য কার্য্যতৎপরতার কথা আমার অনেক দিন থেকেই শোনা আছে, তাই আর কালবিলম্ব না করে আপনার কাছেই চলে এসেছি—আপনি যদি এই অমাবস্যার অন্ধকারে কিছু আলো ফেল্‌তে পারেন!"

—দুই—

ভূপেশ বাবু বর্ণনা শেষ করিয়া থামিলেন।

হুকা-কাশি এতক্ষণ ডান হাতের তেলোর উপর নিজের চিবুকটীর ভার রাখিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত সমস্ত ঘটনাটি শুনিতেছিলেন, ভূপেশ বাবুকে থামিতে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "আচ্ছা, কোনও প্রকারে সন্দেহ পড়্‌তে পারে এমন একজন লোকেরও কি নাম আপনি আমায় বল্‌তে পারেন, ভূপেশ বাবু?"

"দেখুন মিষ্টার হুকা-কাশি, কোন সাধারণ লোক অথবা বাড়ীর কোন ঠাকুর-চাকর এ চুরি করেনি তা অতি সুস্পষ্ট। এত টাকার গহনা ফেলে একটা বাজে ঘড়ি চুরি করে শেষে তাই আবার বাগানে ভেঙ্গে ফেলে রেখে যাওয়া তাদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক হ'তে পারে না। চোর যদি অতি-মাত্রায় সাবধানী না হ'ত তা হ'লে আমি হয় তো বল্‌তাম,

এ কোন্ পাগলের কাণ্ড ! কিন্তু তাও নয় ; ভেবে দেখুন, কতখানি হুঁসিয়ারির সঙ্গে সে কাজটা সমাধা করেছে। ফটকে আমার দরওয়ান্ থাকে, বাড়ীর ভেতরে চাকর-বাকরেরা, অথচ সবাইকার চোখ এড়িয়ে সটান সে আমার শোবার ঘরে দোতালায় উঠে এসেছে। একটা পথের পাগলের কাছে এতখানি সাবধানতা আশা করা যায় কি ? সব দিক্ তলিয়ে দেখ্‌লে মনে হয়, এ এমন একজন লোকের কাজ, বাবার ওপর যার—যে কোন কারণেই হোক্—খুব বড় রকমের একটা রাগ আছে ! তাঁর কোন স্মারক-চিহ্ন পৃথিবীতে থাকে সে তা চায় না। আমার এ অনুমান যদি আপনার বিবেচনায় গ্রাহ্য বলে মনে হয়, তবে আমি এমন একজন লোকের নাম অন্ততঃ কর্‌তে পারি যার দ্বারা এ কাজ হয়তো সম্ভব হয়েছে।”

হুকা-কাশি যে ভাবে বসিয়া ছিলেন ঠিক সেই ভাবে বসিয়া মাথা না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে সে ?”

“সে আমাদের নলকোপারই একজন লোক। আমাদেরই সঙ্গে বিষয়-আশয় নিয়ে মকদ্দমাতে সে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায়। বাবা নিজের দেশভ্রমণ নিয়েই মত্ত থাক্‌তেন, বিষয়-সম্পত্তির দিকে একবার ফিরেও তাকাতেন না। যা দিয়ে যা কর্‌তেন আমাদের

দেওয়ানজী। কিন্তু বাইরের লোকে এত কথা বুঝতে চাইবে কেন, সে লোকটির ধারণা জন্মাল বাবারই চক্রান্তে তাকে পথে বসতে হয়েছে। বাবার শোচনীয় মৃত্যুর পর আমায় ছোটটী পেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে নল-কোপার লোকেদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টার ত্রুটী সে করে নি। কিন্তু বছর দশেক আগে একটা কাণ্ড সে করেছে তা এক-দিকে যেমন আর সব গুলিকে ছাপিয়ে উঠেছে তেম্নি অপর দিকে বাবার ওপর ঝাল তার কতখানি তা আমাদের বেশ ভাল মতেই বুঝিয়ে দিয়েছে। বেশ কিছু টাকা খরচ করে ভাল আর্টিষ্ট্ দিয়ে বাবার একখানা ওয়াটার-পেন্টিং আমি আঁকিয়েছিলাম, এবং নলকোপার মিউনিসিপ্যালিটিকে সেখানা উপহার দিয়েছিলাম ; উদ্দেশ্য ছিল টাউনহলে সেখানা টানান থাক্‌বে—নলকোপার লোকেদের কাছে বাবার একটা স্মৃতিচিহ্নের মত হয়ে রইবে। কিন্তু এক দিন যেতে-না-যেতেই কি হ'ল জানেন, লোকটা ছবিখানাকে মাটীতে পেড়ে ফেলে, লাথির ওপর লাথি মেরে তাকে চূরমার করে দিলে। বাবার মৃত্যুর কত বছর পরে এ ঘটনাটা ঘটেছে শুধু তাই একবার ভেবে দেখুন ! এতদিনেও সে তাঁকে ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌তে পারে নি। এ যে বাবার শেষ চিহ্নটীকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে

ফেল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে সেটা তেমন বিচিত্র নয়। তবে একটা ব্যাপারে একটু যা খট্‌কা বাধ্‌ছে, ঘড়িটা ভেঙ্গে সে আবার সেটাকে রেখে গেল কেন, সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াই না



লাথির পর লাথি মেরে……

তার বেশী স্বাভাবিক।" বলিয়া ভূপেশ বাবু জিজ্ঞাসুভাবে হুকা-কাশির মুখের দিকে তাকাইলেন।

হুকা-কাশি এ কথার কোনই জবাব দিলেন না, কেবল মিনিট্‌ দুই-তিন পাশের জানালাটা দিয়া বাহিরের

দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ আচম্‌কাই যেন তাঁর মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল —তিনি আপনার মনেই মাথাটা বার দুই-তিন নাড়িলেন।

"আচ্ছা, ভূপেশ বাবু, এইবার আপনাকে আমি গোটাকয়েক প্রশ্ন করবো, আপনি ঠিক্‌ঠিক্ তার জবাব দিয়ে যাবেন।······চুরির দিন রাত্রে ঘড়িটা আপনার দেরাজের ভেতরে বন্ধ ছিল, বটে তো? আচ্ছা তার ক'দিন আগে আপনি সেটাকে ঘড়িওয়ালার দোকান থেকে মেরামৎ করে আনিয়েছিলেন বলুন দেখি? এক দিন না দু'দিন? আর সে ঘড়ি-ওয়ালার ঠিকানাটাও আমার চাই, আছে তো সেটা আপনার কাছে?"

ভূপেশ বাবু দস্তুর মত চম্‌কাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "মেরামৎ করিয়েছি? কই, সে কথা তো এখন পর্য্যন্ত আপনাকে ঘুণাক্ষরেও বলা হয়নি!"

হুকা-কাশি একটু হাসিয়া বলিলেন, "সব জিনিষই কি মুখের কথা শুনে তবে জান্‌তে হবে, ভূপেশ বাবু?"

ভূপেশ বাবু একটু মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, শেষে কহিলেন, "বুঝেছি। অর্থাৎ কি থেকে আপনি এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা আদবেই বুঝি নি এবং বোঝার

স্পর্দ্ধাও রাখি নে ; বুঝেছি শুধু এইটুকু যে সাধারণ মানুষে আর আপনাতে তফাৎ কোথায়। আপনি যা বলেছেন তা অতি সত্যি কথা, সে রাত্রে দেরাজে ঘড়িটাকে বন্ধ করে রাখ্‌বার খানিকটা আগেই এক ঘড়ি-ওয়ালার দোকান থেকে সেটাকে মেরামৎ করে এনেছিলাম। দিন তিনেক আগে সেটাকে মেরামৎ কর্‌তে পাঠান হয়েছিল। আপনি ঘড়িওয়ালার ঠিকানাটা চাইছেন, অক্লেশেই তা আপনাকে দিতে পারি। ক্যাশ-মেমো আমার কাছেই আছে, চাইলেই তা' দিতে পারি।"

হুকা-কাশি পুনরায় কহিলেন "আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনার বাগানটা সম্বন্ধে—সেটা কি একটানা ফুলেরই বাগান, না তার ভেতর আরও কিছু আছে ?"

একটু আশ্চর্য্য হইয়া ভূপেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে ?"

হুকা-কাশি হাসিয়া কহিলেন, "মানে সোজাই। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে অনেকের বাগানে তো জলের ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড়, এ সব থাকে, আপনার বাগানটাতেও কি সে সব আছে, নাকি সেটা একটানা ফুলেরই বাগান ?"

বাগানের এই বিশদ বর্ণনার সহিত ঘড়ি-চুরির কী যে

সম্পর্ক জমীদার ভূপেশ বাবু তাহা ভাবিয়া পাইলেন না, কিন্তু তথাপি কহিলেন, "কৃত্রিম পাহাড় নেই বটে, তবে ফোয়ারা আছে।"

"হু'চারটা, না কি সারবন্দী অনেকগুলো?"

"না, নিতান্ত হু'চারটাও নয়।"

হুকা-কাশি আর কোন তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বেশ বোঝা গেল যে প্রশ্নগুলির জবাবে তিনি প্রসন্নই হইয়াছেন। কহিলেন, "আপনার বাড়ীটা একটু ভাল করে দেখা আমার প্রয়োজন; বেলা তিনটে থেকে চারটা পর্য্যন্ত আপনি বাড়ী থাক্‌বেন, সেই সময়ে আমরা আপনার ওখানে যাব। তার পর আমার ওপর আর সব ভার ফেলে রেখে আপনি আপনার নিজের কাজকর্ম্মে মন দিতে পারেন, প্রয়োজন বোধ কর্‌লে আপনাকে আমরা খবর দেব।"

"নলকোপার শ্রীশ চাটুয্যের ওপর একটু নজর রাখা দরকার মনে করেন না?"

"উঁহু, বর্ত্তমানে সে সবের কোন দরকারই নেই।"

"আপনার কি ধারণা ঘড়িওয়ালাও এর সঙ্গে একযোগে রয়েছে?"

কিন্তু হুকা-কাশির ভাবে বোধ হইল তিনি আর

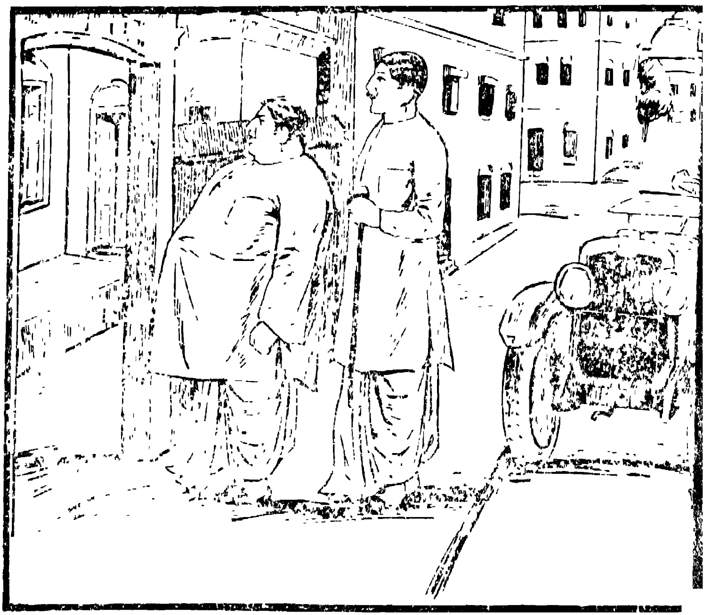
এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আপাততঃ প্রস্তুত নহেন, বলিলেন, "আসলে জানেন কি ভূপেশ বাবু, ব্যাপারটা আদবেই স্বচ্ছ নয়, অনেকখানি গভীর! এখন আর এ সম্বন্ধে আলোচনা করে লাভ নেই, কেননা সে আলোচনা হবে শুধু অনুমানের ওপরই নির্ভর করে। কেবল মাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমি কখনই কোন কাজ করিনে।"

আর দু'চারটী কথার পর ভূপেশ বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইতেই হুকা-কাশি একটু উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই দেখিলেন, তাঁহার বাড়ীর দরজায় একখানা ট্যাক্সি আসিয়া ধীরে ধীরে থামিয়া পড়িল।

—তিন—

দেখা গেল, ট্যাক্সি হইতে নামিল দুই জন ব্যক্তি। প্রথমে যে ব্যক্তি নামিল তাহার বয়স এমন কিছু বেশী নয়, রণজিতেরই সমবয়সী, অর্থাৎ বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে। কিন্তু এক দিক্ দিয়া তাহার চেহারাখানা যে দেখিবার বস্তু তা'তে আর সন্দেহ নাই; একটী সচল ফুটবল বলিলেই তার ঠিক বিবরণ দেওয়া

হয়। তার পেছনে যিনি আসিলেন তিনি তাঁর সঙ্গের যুবকটীর চাইতে ছ' সাত বছরের বড় হইবেন—বেশ লম্বা চওড়া, সুশ্রী পুরুষ।



সচল 'ফুটবল'

হুকা-কাশির ঘরে আসিয়া প্রথমে কথা আরম্ভ করিলেন এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটী, কহিলেন, "এই অসময়ে

আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম বলে মাপ চাইছি! কিন্তু যে ব্যাপার নিয়ে আমাদের এ সময়ে এখানে আসা সেটা কেবল মাত্র আমাদেরই নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার নয়, সমস্ত বাংলা দেশের—আর শুধু বাংলা দেশই বা বলি কেন, গোটা ভারতবর্ষের—স্বার্থ এরই সঙ্গে জড়ানো রয়েছে।" বলিয়া ভদ্রলোক হুকা-কাশির মুখের দিকে তাকাইলেন।

"কি রকম?" হুকা-কাশি চোখ তুলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে ভদ্রলোকটীর মুখের দিকে চাহিলেন, রণজিৎও ঔৎসুক্য-মাখান দৃষ্টি ভদ্রলোকের উপর অর্পণ করিল।

"আজকের খবরের কাগজে প্রোফেসার গুপ্তের কথা নিশ্চয়ই আপনারা পড়েছেন; খবরটা দাবানলের মত কল্‌কাতার এধার থেকে ওধার অবধি ছড়িয়ে পড়েছে, কাজেই সেটা যে এখন পর্য্যন্ত আপনাদের কাণে আসেনি, এ আমার মনে হয় না। ওঃ, দেশের কত বড় একটা দুর্ভাগ্য বলুন দেখি! আমরা আস্‌ছি তাঁরই বাড়ী থেকে। এই যিনি আপনাদের সাম্‌নে বসে রয়েছেন," বলিয়া ভদ্রলোক ইসারায় সেই সচেতন ফুটবলটীকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইনি হচ্ছেন বিমল বাবু, প্রোফেসার গুপ্তের বড় ছেলে; আর আমার নাম

বিরূপাক্ষ আচার্য্য, আমি তাঁরই ল্যাবোরেটারীর তত্ত্বাবধায়ক।”

ভদ্রলোকটী একটু থামিলেন। ভাবের জোয়ার ভাঁটা বলিয়া কোন পদার্থ হুকা-কাশির মুখে সচরাচর বড় একটা খেলে না, তিনি নিবিষ্টমনে, স্থিরভাবে কথাগুলি শুনিয়া যাইতে লাগিলেন; কিন্তু রণজিৎ দস্তুরমত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সমস্তটা কথা শুনিবার জন্য সে ব্যগ্রভাবে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া বসিল। তাইতো, ইঁহারা এখানে কি মনে করিয়া!

ভদ্রলোক আবার স্থুরু করিলেন, “গত পাঁচ ছ’মাস থেকে প্রোফেসার গুপ্ত যে নিদারুণ পরিশ্রম আরম্ভ করেছিলেন তাতে বোধ করি লোহার শরীরও গুঁড়ো হয়ে যায়। হ্যাঁ, একেই বলি সাধনা! ফাঁকি দিয়ে দুনিয়ায় যে কোন বড় কাজই হয় না, তা বোধ করি আমাদের এ অতিবুদ্ধি জাতটা প্রোফেসার গুপ্তের জীবন থেকেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। দিন নেই, রাত নেই, নিজের কাজেই তন্ময় হয়ে রয়েছেন। আমরা আপত্তি কর্‌তাম, ‘স্যার, এম্‌নি করে কি শেষে একদিন নিজের জীবনটাই নষ্ট কর্‌বেন?’ তা, সে কথা তিনি কাণেই তুল্‌তেন না। শেষে দেখ্‌ছি এতদিন যা আশঙ্কা করে আস্‌ছিলাম

তাই হল। প্রোফেসার গুপ্তের এ দুর্ঘটনা যে তাঁরই সেই অমানুষিক পরিশ্রমের ফল তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? কিন্তু বিমল বাবুকে এ কথাটা কেউই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারছে না। কি থেকে এঁর ধারণা জন্মেছে ব্যাপারটাতে কোথায় একটু গোলমাল আছে, সে ধারণা তাঁর কিছুতে গেল না। আপনার নাম ইনি কোথায় এঁর এক বন্ধুর কাছে শুনেছেন, এবং শুনেই আমায় শুদ্ধ সঙ্গে করে নিয়ে এখানে চলে এসেছেন।”

ভদ্রলোক নিঃশ্বাস লইবার জন্য সামান্য একটু থামিতেই প্রোফেসার গুপ্তের বিমল নামক সেই 'রোগা' পুত্রটী কহিল “খট্‌কা কেনই বা লাগ্‌বে না, সেইটে আমায় বলুন দেখি বিরূপাক্ষ বাবু! শুধু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ওপরই যে সবটা দোষ সকলে মিলে চাপাচ্ছেন, তাই যদি হবে, তবে বাবা তাঁর শরীর দিনকে-দিন দুর্ব্বল বোধ কর্‌তেন নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সে রকম কিছু বোধ করা দূরে থাক্, আমি জানি তাঁর শরীরের বল আর মনের উৎসাহ যেন প্রত্যহ বেড়েই চল্‌ছিল। কাল্‌কে এ ঘটনাটা ঘট্‌বার ঠিক্ আগে চা খেতে যখন তিনি ওপরে এলেন তখন কথাবার্ত্তা কারো সঙ্গে তাঁর বিশেষ কিছু হয়নি বটে, কিন্তু যে রকম প্রফুল্ল

তখন তাঁকে দেখা গেছ্‌ল, বোধ হয় গত দশ বছরের ভেতর তেমনটী আর কখনো তাঁকে দেখিনি। আর তার পাঁচ-সাত মিনিট পরে নীচে গিয়ে ঐ রকম কাৎরানি এবং সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ঘোর উন্মাদের মত প্রলাপ! এতে যে খট্‌কা লাগ্‌বারই কথা বিরূপাক্ষ বাবু!”

এতক্ষণ পরে হুকা-কাশি প্রথম কথা কহিলেন, “গত ক’মাস ধরে শুনেছি প্রোফেসার গুপ্ত কি একটা রাসায়নিক গবেষণা কর্‌ছিলেন; কি সম্বন্ধে সে গবেষণাটা তা আমায় আপনারা বল্‌তে পারেন কি?”

বিরূপাক্ষ বাবু কহিলেন, “সেই তো হয়েছে ল্যাঠা মশাই! কিসের ভেতরে যে তিনি ডুবে ছিলেন তা আর এখন জান্‌বার এতটুকু উপায় নেই। আমি, মনে করুন, তাঁর ল্যাবোরেটারীরই তো লোক, ব্যাপারটা আমার অন্ততঃ জান্‌বার কথা। কিন্তু এত গোপনে অধ্যাপক মশাই কাজ করে যাচ্ছিলেন যে আমি পর্য্যন্ত এতটুকু আঁচ্‌তে পারিনি। সকালে বারাক্‌পুর থেকে এসে কাজে লাগ্‌তাম—আমি আবার ডেলি-প্যাসেঞ্জার কিনা—দুপুরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল ওঁরই ওখানে; সন্ধ্যায় ফের বাড়ী ফিরে যেতাম। কিন্তু নিতান্ত দরকার না পড়্‌লে অধ্যাপক মশাই নিজের ঘরে আমাকে পর্য্যন্ত ডাক্‌তেন না। এই

রকম ভাবেই দিনের পর দিন চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কাল সকালে বাড়ীতে ঢুকেই দেখি কিনা বিমল বাবু ওঁরা প্রোফেসার গুপ্তকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর আর তখন বাহ্যজ্ঞান বলে কোন বস্তুই নেই !"

মিনিট্ খানেক কেহই কোন কথা কহিলেন না, ঘরের ভিতরে পূর্ণ নিস্তব্ধতা অবাধে বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু সে শুধু মিনিট খানেকের জন্যই। তার পরেই হুকা-কাশি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "প্রোফেসার গুপ্ত দেশের উজ্জ্বল রত্ন, তাঁর কোন উপকারে লাগ্‌তে পার্‌লে আমি নিশ্চয়ই নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে কর্‌ব। আপনারা যান, তাঁর চিকিৎসার কোন রকম ত্রুটী যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখুন গে'। যাবার সময় শুধু এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে যান যে এর ভেতরে কোথাও যদি কোন রহস্য থেকে থাকে তো তার মীমাংসা কর্‌তে আমার তরফ্ থেকে চেষ্টার ত্রুটী হবে না।"

আগন্তুক দুইটী দৃষ্টির অন্তরাল হইতেই রণজিৎ বলিয়া উঠিল, "প্রোফেসার গুপ্তের ব্যাপারটাও যে দেখ্‌ছি রীতিমত ঘোলাটে হয়ে উঠ্‌লো মিষ্টার হুকা-কাশি ! রহস্য-টহস্য বাস্তবিকই এর ভেতরে কিছু আছে নাকি ?"

একটু যেন আশ্চর্য্য হইবার সুরে হুকা-কাশি কহিলেন, "সে এখন আমি কি করে বল্‌ব ? ব্যাপারটা ভাল করে দেখে শুনে নেবার আগেই আমায় একটা মন-গড়া গল্প আপনি খাড়া কর্‌তে বলেন নাকি ? আর তা ছাড়া আমার মগজে এখন ঘুর্‌ছে অন্য জিনিষ। আপনাদের মহা-ভারতের সেই অর্জ্জুনের গল্প জানেন তো ? অস্ত্র-চালনার সময় দুনিয়ার কোন জিনিষই তার চোখে আসেনি, শুধু চোখে ভাস্‌ছিল পাখীর চোখটা, যেটা কেটে পেড়ে ফেল্‌তে হবে ! তেম্‌নি আমার মনেও এখন ঘুর্‌ছে শুধু একটী কথা—তিনটে থেকে চারটের ভেতর ভূপেশ বাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে এন্‌গেজমেণ্ট্।" হাতের রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌টার দিকে একবার তাকাইয়া তিনি কহিলেন "ওঃ, বেলা যে এগারোটা বেজে গেছে দেখ্‌ছি ! আমি বলি রণজিৎবাবু, ডান হাতের ব্যাপারটা আজ এখানেই হয়ে যাক্ না ! ভয় নেই, ভয় নেই, ফড়িংএর ঘণ্ট না হয় আপনি না-ই খেলেন, যদিও চিংড়ি পোকা খেলে জাপানীদের ফড়িং বেচারা যে কি অপরাধ কর্‌ল তা ন্যায়-শাস্ত্রের কোন পুঁথিতেই লেখে না !"

বেলা সাড়ে তিনটার সময় হুকা-কাশি রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া ভূপেশ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। ভূপেশ বাবু ধনী এ কথা তাঁহারা দুজনাই জানিতেন, কিন্তু তিনি যে কত বড় ধনী সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না। কলিকাতা সহরের উপর তিন চার বিঘা জমি লইয়া প্রকাণ্ড অট্টালিকা! গেটের ভিতর ঢুকিতেই মখমলের মত সবুজ ঘাসের চত্বর, এবং সেই চত্বরটিকে মধ্যে রাখিয়া দুইটী লাল সুড়কির রাস্তা গোল হইয়া বাড়ীর সিঁড়ির নিকট আসিয়া এক হইয়া গেছে। প্রথমেই একটী বিস্তৃত বারান্দা এবং সেই বারান্দা হইতে দোতালার দুইদিকে দুইটী মার্ব্বেলের সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীর দুই পাশে বিস্তৃত ফুলের বাগান এবং তাহার মধ্যে সারি সারি অসংখ্য ফোয়ারা হইতে জল উঠিতেছে! হুকা-কাশি বুঝিলেন এগুলি সম্বন্ধেই ভূপেশ বাবু বিনয় করিয়া বলিয়াছিলেন, "একেবারে দু একটাও নয়।"

বেহারার হাতে হুকা-কাশি তাঁহার নিজের নামের কার্ড্‌খানা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই মার্ব্বেলের সিঁড়ি দুইটীর পানে চাহিয়া রহিলেন। সিঁড়ি দুইটী দোতালায় উঠিয়া পুনরায় যে বারান্দা পাইয়াছে সেটীও তিনি নানা রকম ভাবে দেখিলেন। একটু পরেই বেহারা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে উপরের বসিবার

ঘরে আনিয়া হাজির করিল এবং তাহার ক্ষণকাল পরেই জমীদার ভূপেশ বাবু সেখানে আসিলেন। তাঁহার হাতে একটী কৌটার মধ্যে একটা ভাঙ্গাচূরা ঘড়ি ও একখানা ভাঁজ করা কাগজ।

ভূপেশ বাবু ও রণজিৎ দু'জনেই ভাবিয়াছিলেন যে, যে ঘড়িটীর সহিত এমন একটা আশ্চর্য্য ইতিহাস জড়িত, সেটী হাতে পাইলে হুকা-কাশি কতই-না-জানি গভীর ভাবে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন এই দেখিয়া যে হুকা-কাশি সে রকম বিশেষ কিছুই করিলেন না। তিনি কেবল কৌটাশুদ্ধ ঘড়িটী একবার এ-পিঠ ও-পিঠ ঘুরাইয়া দেখিলেন এবং পরক্ষণেই ভূপেশ বাবুকে সেটা ফিরাইয়া দিয়া, তাঁর হাতের ভাঁজ করা সেই ক্যাশ-মেমোটী চাহিয়া লইয়া কহিলেন, "আমার কাজ হয়ে গেছে, আপনার অনুমতি হয়তো আমরা উঠি, ভূপেশ বাবু!"

"সে কি! এই না বল্‌ছিলেন, আমার বাড়ীটা একটু ভাল করে দেখা আপনার প্রয়োজন?"

"তা কি আর বাকী আছে ভূপেশ বাবু? গেট্ দিয়ে ঢুকলাম, এত বড় একটা কম্‌পাউণ্ড্ পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আপনার ওপরের বসবার ঘরে এসে হাজির হলাম, এর

পরেও কি বল্‌তে চান বাড়ীটা আমাদের দেখা হয় নি ?... ...অন্দর থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে আস্‌তে হ'লে দোতালার এই বারান্দাটাই দেখ্‌ছি একমাত্র পথ ! এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ আছে কি ?”

ভূপেশ বাবু বলিলেন, “না, তেমন পথ আর নেই। তবে একতালায় চাকরদের ঘরের কাছে একটা খিড়কির দোর আছে। জমাদার-টমাদার সেই পথে আসে যায়। এখুনি উঠ্‌তে চাইছেন ? আচ্ছা দাঁড়ান, আমি তবে চা'টা আনাই। আর প্রয়োজন বোধ কর্‌লে আমার গাড়ী খানাও কিন্তু স্বচ্ছন্দে আপনাদের কাজে লাগাতে পারেন।”

“চা'তে আপত্তি নেই, কিন্তু গাড়ীতে দরকার নেই, সে জন্যে আপনি মোটেই ব্যস্ত হবেন না।”

চা-পানান্তে ভূপেশ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া দু'জনে গেটের বাহিরে চলিয়া আসিতেই হুকা-কাশি কহিলেন, “একটা ব্যাপার কিন্তু ভারী মজার—ক্যাশ-মেমোতে দেওয়া দোকানের এ ঠিকানাটা কিন্তু প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ীর খুবই কাছে।...একই জায়গায় পাশাপাশি দু'-দুটো রহস্য। ব্যাপার মন্দ নয়। আমরা কিন্তু এবার চল্‌ছি এই ঘড়ির দোকানেরই সন্ধানে।”

বড় রাস্তা দিয়া হু হু করিয়া মোটর বাস্ আসিতেছিল, তাহাতে চড়িয়া দু'জনে শীঘ্রই তাঁদের গন্তব্য স্থানেআসিয়া পোঁছিলেন। নম্বর অনুযায়ী দোকানটীকে খুঁজিয়া বাহির করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, যদিও দোকানটী একটু গলির ভিতরেই।

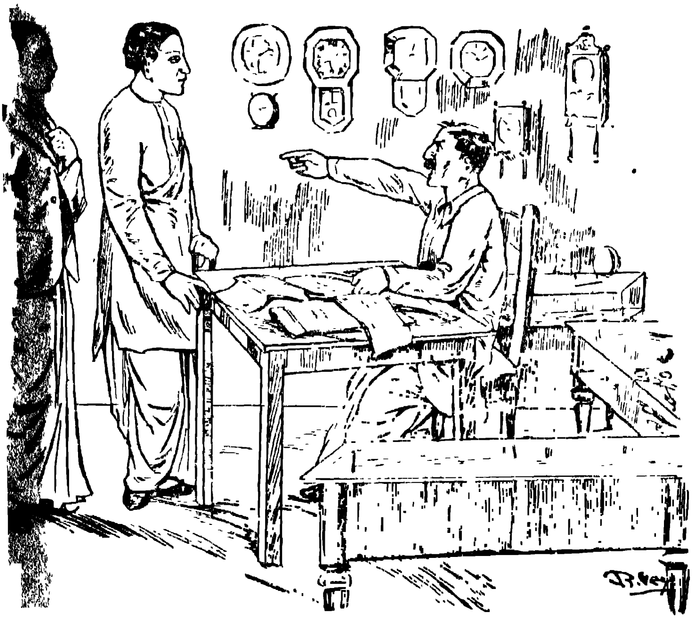
হুকা-কাশি একেবারে ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। আধা-বয়সী একটী লোক টেবিলের সাম্‌নে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ মনে কতগুলি কাগজ ও খাতাপত্র লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল, অনুমানে হুকা-কাশি বুঝিলেন সে-ই দোকানের মালিক হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, দোকানটা কি আপনার ?"

লোকটী যেমন ঝাঁঝাল সুরে এ কথার প্রত্যুত্তর দিল তাতেই বোঝা গেল সে তখন কী পরিমাণ রাগিয়া ছিল। কহিল "হুঁ ; কি দরকার শুনি !"

"দরকার একটু আছে বই কি ? একটা খবর জান্‌বার জন্যে..."

হুকা-কাশির কথা সমাপ্ত হইতে পারিল না, লোকটা একেবারে হুঙ্কার দিয়া কহিয়া উঠিল, "খবর চাই ? সরে পড়ুন মশাই, সরে পড়ুন, এটা খবরের কাগজের আপিস্ নয় ! চৌরঙ্গীতে যান, 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' রয়েছে, আর নয়তো

বাগ্‌বাজারে যান 'পত্রিকা' আছে। মোদ্দা এখানে কিছুই



সরে পড়ুন

হবে না।"

—চার—

ধমক খাইয়া হুকা-কাশি প্রথমে যেন একটু ভড়্‌কাইয়া লন, কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তেকেরই জন্য। তার পরেই

নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া নিতান্ত হাল্কা গলায় তিনি কহিলেন, "আরে দাদা, তুচ্ছ কারণে কি এমন চট্‌তে আছে ?"

কিন্তু লোকটীর নাকি মেজাজ তখন নিতান্তই বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল, এমন আপ্যায়িতের 'দাদা' ডাকেও তার মন ভিজিল না, সে কহিল, "হ্যাঁ মশাই, আছে। জিনিষ কেনার নামে তো লবডঙ্কা, যত রাজ্যের ভবঘুরে সব দোকানে সেঁদিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্যক্ত করে মারবে ! যখন-তখন সবাইকে আমোল দি-ই বলেই তো কাল রাত্রে অমন কাণ্ডটা ঘট্‌তে পার্‌লো !"

"কি কাণ্ড মশাই ?"

"চুরি-ই, চুরি,—চ'য়ে হ্রস্বউকারে চু, আর র'য়ে হ্রস্ব ইকারে রি !"

"কি সর্ব্বনাশ ! ঘড়ির দোকানে চুরি ! বহু টাকার মাল সরিয়েছে তবে বলুন !"

হুকা-কাশির সহানুভূতিপূর্ণ কথায় দোকানদার ক্রমেই ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল, কহিল, "নিতে পারতো ঢেরই তাতে আর সন্দেহ নাই, তবে নেয়নি। আশ-পাশে হয়তো কোথাও কোন লোকজন দেখে ভয় খেয়ে গেছ্‌ল, তাই অল্প নিয়েই সট্‌কেছে। এ পর্য্যন্ত যতদূর

খোঁজ পাচ্ছি তাতে শুধু একটা ঘড়ির সন্ধান মিল্‌ছে না। কিন্তু অতি ত্যাঁদোড় লোক, খাতা-পত্তরগুলো পর্য্যন্ত বাদ দেয় নি—দেখুন কি ভাবে এখানার পাতা ছিঁড়ে দিয়ে গেছে” বলিয়া লোকটী একটা মোটা বাঁধান খাতা হুকা-কাশির দিকে বাড়াইয়া দিল। হুকা-কাশি দেখিলেন, সেখানা দোকানের অর্ডার-বুক্।

সেখানার প্রতি একবার একটু দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হুকা-কাশি কহিলেন, “যা বলেছেন দাদা, একেবারে পাজির পা-ঝাড়া ; তবে মন্দের ভাল এই যে অল্পের ওপর দিয়েই গেছে।”

“অল্পই হোক্ আর বেশীই হোক্, নিজের ট্যাঁক্ থেকেই তো গর্‌চা দিতে হবে মশাই! খদ্দের কি আর তার পও্‌হা ছেড়ে দেবে? ওই তো, আপনার সাম্‌নেই তো অর্ডার বুক খানা রয়েছে, পাঁচশো আঠার নম্বরের অর্ডারটা।”

দোকান-দারের কথা শেষ হইতে-না-হইতেই হুকা-কাশি তড়িদ্বেগে অর্ডার-বুক খানা খুলিয়া ফেলিলেন। ঘড়িওয়ালা দেখিল না, রণজিৎও লক্ষ্য করিল কিনা জানি না, সেই অর্ডারটীর উপর নজর পড়িতেই হুকা-কাশির দুই চোখ দিয়া যেন বিদ্যুৎ ধাঁধিয়া গেল, সমস্ত মুখখানা গভীর আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু মুখের প্রসন্ন ভাব বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেওয়া হুকা-কাশির স্বভাব নয়, গম্ভীরস্বরেই তিনি বলিলেন, "যাক্, যা হয়ে গেছে সে বিষয়ে ভেবে আর কি করবেন! হ্যাঁ দেখুন, একটা কথা, আপনি যে গোড়াতেই আমাদের ভবঘুরে আর জিনিষ কেনবার বেলায় 'লবডঙ্কা' বলে ভেবে নিয়েছেন সেটা কিন্তু সত্যি নয়। আসলে আমরা জিনিষ কেনাসম্বন্ধেই খোঁজ-খবর নিতে এসেছিলাম। দেখুন, ভোরের বেলাটায় ঘুম থেকে ওঠা আমার কুষ্ঠিতে কখনো লেখে নি; অথচ শুধু এই কারণেতেই কি পরিমাণ কাজ যে আমার রোজ রোজ ভণ্ডুল হয় তা আর কি বল্ব। তাই ভেবেছিলাম খোঁজ নেব অল্প দামী এলার্ম্ ঘড়ি আপনারা একটা দিতে পারেন কিনা। সাড়ে চার টাকার ওপরে কিন্তু আমি উঠ্তে পার্ব না।"

ঘড়িওয়ালা এই প্রশ্নে বেশ খুসী হইয়া কহিল, "আর আনা চারেক উঠুন, দিব্যি এক জার্ম্মেন মাল দিয়ে দেব, ঝাড়া তিনটী বছর যাবে।"

চার আনা পয়সা তাঁর পক্ষে খরচ করা কঠিন, তবে নিতান্ত দায়ে ঠেকিলে তা তিনি করিতে পারেন—মুখের ভাবটাকে ঠিক এই রকম করিয়া হুকা-কাশি কহিলেন,

"তা নিতান্ত দরকার হ'লে না হয় পৌনে পাঁচ টাকাতেই ওঠা যাবে, কি বলেন রণজিৎ বাবু।"

ঘড়িওয়ালা তখন চেয়ার ছাড়িয়া ঘরের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল এবং রণজিৎদের দিকে পেছন ফিরিয়া একটা বড় আলমারীর গায়ে চাবি লাগাইল। হুকা-কাশি একবার আড়্-চোখে ত্রস্তভাবে সেই দিকে তাকাইলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সেই মোটা অর্ডার-বুক্ খানা খুলিয়া ফেলিয়া গভীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে করিতে পাঁচ-সাতটী পাতা হু হু করিয়া উল্‌টাইয়া গেলেন। এই পাঁচ-সাতটী পাতায় এমন গভীর গবেষণার কি বস্তু যে তিনি পাইলেন রণজিৎ তাহার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুধু লক্ষ্য করিল প্রত্যেকখানি পাতা উল্‌টাইবার সঙ্গে সঙ্গে হুকা-কাশির মুখ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে এবং শেষ পাতাখানি উল্‌টাইবার পর তাঁহার মুখে যেন আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

একটু পরে ঘড়িওয়ালা ফিরিয়া আসিয়া মুখখানাকে বাংলা পাঁচের মত করিয়া কহিল, "না মশাই, সে মালটা ঘরে নেই আর।"

গম্ভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া হুকা-কাশি কহিলেন,

"তা হলে আর কি হবে বলুন! বড়ই নিরাশ হলাম।"

দোকান হইতে বাহিরে আসিবার পর রণজিৎ বলিল, "আপনি কিন্তু ফের আপনার স্বভাবসুলভ হেঁয়ালি আরম্ভ করেছেন, মিষ্টার হুকা-কাশি। হঠাৎ এলার্ম্ ঘড়ির দরকার পড়াটা না হয় বুঝলাম ধাপ্পা—একটু সময়ের জন্য দোকান-দারকে অন্যত্র সরিয়ে অর্ডার-বুক্ থেকে কিছু একটা দেখে নিলেন। কিন্তু কাল রাত্রে তার দোকানে চুরি হয়ে গেছে শুনে আপনি ওরকম উৎফুল্ল হয়ে উঠ্লেন কেন?"

হুকা-কাশি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—"বেচারা ঘড়িওয়ালার কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে বলে আমি খুসী হয়েছি—এই যদি আপনার ধারণা হয়ে থাকে তবে কিন্তু আপনি মস্ত ভুল কর্ছেন। আমি খুসী হয়েছি ঐ পাঁচশো আঠার নম্বরের ঘড়িটী চুরি যাওয়ার দরুণ, কেননা সেটী চুরি না গিয়ে যদি পাঁচশো উনিশ নম্বরেরটি চুরি যেত তা হ'লে খুসী না হ'য়ে, দোকান-দারের এ ক্ষতিতে আপনার মত আমারও দুঃখ হত।"

"ঐ পাঁচশো আঠার নম্বরের ঘড়িটাই কি তবে ভূপেশ বাবুর ঘড়ি নাকি?" রণজিৎ সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

"এই দেখুন! কি যে আপনি বলেন রণজিৎ বাবু,

তার কোন ঠিক ঠিকানাই নেই। দিব্যি নিজের কানে ভূপেশ বাবুর মুখ থেকে শুনলেন যে তিনি নিজে হাতে দোকান-দারের কাছ থেকে ঘড়িটী সারিয়ে নিয়ে গেছেন, তবু আপনি জিজ্ঞেসা করছেন দোকান থেকে চুরি-যাওয়া ঘড়িটাই ভূপেশ বাবুর ঘড়ি কিনা !"

"তবে ও ঘড়িটা কার, এবং চুরিই বা করলে কে ?"

"এ বড় কঠিন প্রশ্ন রণজিৎ বাবু, ঘড়ি কার এবং কে তা বাগালে এ-দু'য়ের কোন প্রশ্নের জবাব দেওয়াই আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়, কারণ, এ দু'য়ের কিছুই আমি জানি না। হ্যাঁ, অবশ্য পাঁচশো আঠারো নম্বরের ঘড়িটা খাতায় কার নামে লেখা আছে তা দেখে কার ঘড়ি তা বলা যায় বটে কিন্তু সে বলার কোন মানেই হয় না, কেননা এই কলকাতা সহরের তের চোদ্দ লাখ লোকের মধ্যে সে যে কে তার আমি কিছুই জানি না।"

"অথচ সে সব কিছু না জেনে শুনেই আপনি এতখানি খুসী হয়েছেন যে দেখে মনে হল বুঝিবা আপনার রাজ্যলাভই হয়েছে !" বলিয়া রণজিৎ হাসিল।

হুকা-কাশি বলিলেন, "খুসী হবার বাস্তবিকই কারণ ঘটেছে রণজিৎ বাবু ! ওই ঘড়িটা চুরি যাওয়ায় রহস্য অনেকখানিই ভেদ হয়ে গেছে যে !"

কথা বলিতে বলিতে মোড়টা ছাড়াইয়া দু'জনাই একটু আগাইয়া আসিলেন; সন্ধ্যা তখনও হয় নাই, তবে সূর্য্যদেব আমাদের দিক্‌টা ছাড়িয়া আমেরিকা-অঞ্চলে যাওয়ার যোগাড় প্রায় করিয়া আনিয়াছেন, বোধ হয় আধ ঘণ্টাটেকের মধ্যেই রওনা হইয়া পড়িবেন। তাঁর আলোক অনেকটা সমান্তরাল রেখার মত পৃথিবীর গায়ে আসিয়া পড়িতেছিল। গলিটাতে লোকজন কেউই নাই, এক পাশে একটা ডাষ্ট্‌বিন্ রাজ্যের জঞ্জাল বুকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ রণজিতের দৃষ্টি সেই ডাষ্ট্‌বিনে পড়ায় তার নজরে আসিল সূর্য্যের আলোক কি একটা সাদা জিনিষের উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর সেই আলোতে জিনিষটা ঝক্ মক্ করিতেছে। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে বিস্ময়ের আর তার সীমা রহিল না—একটা ঘড়ি সেই আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি রণজিৎ হুকা-কাশির দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, "দেখুন দেখুন, এ কি কাণ্ড! এ যে দেখ্‌ছি ঘড়ির হরিলুট্ সুরু হ'ল!"

হুকা-কাশি অল্পক্ষণ সেদিকে তাকাইয়া কি একটু ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "হুঁ, ব্যাপারটা আশ্চর্য্য তাতে

সন্দেহ নাই, তবে ঠিক এই রকমই একটা কিছু কিন্তু আমি মনে মনে প্রত্যাশাও কর্‌ছিলাম।"

রণজিৎ ঘড়িটী হাতে করিয়া তুলিতে যাইতেছিল কিন্তু হুকা-কাশি বাধা দিয়া কহিলেন, "উঁহু, ওটীতে হাত দেবেন না, ওটিই হচ্ছে পাঁচশো আঠারো নম্বরের ঘড়ি, একটু আগেই যেটীর উল্লেখ কর্‌ছিলাম।"

রণজিৎ নিরস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হোলই যেন পাঁচশো আঠারো নম্বরের ঘড়ি, কিন্তু সেজন্য আপনি আমায় হাত দিতে বারণ কর্‌ছেন কেন?"

"বুঝ্‌বেন, পরে বুঝ্‌বেন। একটা কথা স্থির জান্‌বেন যে এই পাঁচশো আঠারো নম্বরের ঘড়িটা চুরি করা চোরের মোটেই মৎলব ছিল না। এটী নিয়েছিল সে ভুল ক'রে। তার আসল মৎলব ছিল ভূপেশ বাবুর ঘড়িটাই সরানো—কি জন্য তা পরে আস্তে আস্তে প্রকাশ পাবে। এটী নিয়েছিল সে ভুল করে। ভূপেশ বাবুর ঘড়িটার মার্কা হচ্ছে 'ষ্টোভার'। তিনি যখন তাঁর ঘড়িটা বসবার ঘরে আমাদের কাছে নিয়ে এলেন তখনই নামটা আমি লক্ষ্য করেছি। চোর ছিল ভূপেশ বাবুরই এই ষ্টোভার ঘড়িটার সন্ধানে। ষ্টোভার ঘড়ি খুব পুরোনো হয়ে গেছে, আজকাল এর চলন খুবই কম। কিন্তু দৈবের

ব্যাপার, ভূপেশ বাবু ছাড়া আরও একজন লোক ষ্টোভার ঘড়িই আর একটা এই একই ঘড়িওয়ালার দোকানে মেরামৎ কর্তে দিয়েছিল। ভূপেশ বাবু এসে তাঁর ঘড়ি সারিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর চোরের পো এল ভূপেশ বাবুর ঘড়িটীর উদ্দেশ্যে। সামনেই পাঁচশো আঠারো নম্বরের ষ্টোভার ঘড়িটী দেখে অম্নি খপ্ করে পকেটে সে তা পূরে ফেল্লে। বাইরে এসে একটু বাদেই কিন্তু সে তার ভুল বুঝ্তে পার্‌ল—বুঝল যে ঘড়ির উদ্দেশ্যে সে এসেছে সেটার বদলে অন্য একটা ঘড়ি সে চুরি করেছে। তখন নিতান্ত বিরক্ত ভাবে ঘড়িটাকে সে ডাষ্ট্‌বিনে ফেলে দিলে। তারপর আবার দোকানে ঢুকে ফের সেই ভূপেশ বাবুর ষ্টোভার ঘড়িটীর খোঁজ্। পাতি পাতি ক'রে খুঁজেও যখন সন্ধান মিল্‌ল না তখন অবশ্য তার বুঝ্তে বাকী রইল না যে ঘড়ির মালিক সেটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তা যাক্, অর্ডার-বুকে ঘড়ির মালিকের নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে, তাই দেখেই চোর সে ঘড়ির সন্ধান করে ফেল্‌বে। অর্ডারের খাতাখানা খুলেই দেখ্তে পেলে দু'টী ষ্টোভার ঘড়ি তাতে জমা আছে —একটী তার মালিক ফিরিয়ে নিয়ে গেছে, বাকীটী দোকানেই রয়েছে। মালিক যেটী ফিরিয়ে নিয়েছে

নামধাম-সমেত সে পাতাখানা চোর অর্ডার-বুক্ থেকে ছিঁড়ে ফেলে পকেটে পূর্‌লে। তারপর রাতারাতি ঠিকানা অনুযায়ী ঘোষ-চৌধুরীর বাড়ীতে এসে নিজের কাজটী হাসিল কর্‌তে তার বেশী বেগ পেতে হয় নি।”

একটুখানি থামিয়া হুকা-কাশি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, “দোকানে ঢুকে ঘড়িওয়ালার মুখে যখন শুন্‌লাম এতগুলি ঘডির ভেতর শুধু একটী মাত্র ঘড়ি খোয়া গেছে তখনই আমার মনে কেমন সন্দেহ হোল। এত দামী দামী ঘড়ি ছেড়ে চোর শুধু একটা ঘড়ি নিয়ে ভেগে পড়্‌ল! ব্যাপাবটা কি, হঠাৎ সে পরমহংস হয়ে উঠ্‌ল নাকি? স্বভাবতঃই জান্‌তে ইচ্ছা হোল, কি রকমেব ঘড়ি চুরি গেছে! খাতা খুলেই দেখি ষ্টোভার ঘডি। জানা আছে, ভূপেশ বাবুব ঘড়িটাও ষ্টোভার ঘড়ি এবং সেটাও এই-খানেই ছিল। কাজেই বুঝ্‌তে আর কষ্ট হল না যে, দু’টী চুরির ভেতব বেশ একটা সম্পর্ক আছে, এবং চোর যেই হোক্-না-কেন, একই ব্যক্তি। তারপর আপনার হয়তো মনে আছে, ঘড়িওয়ালা বলেছিল চোরা নাকি অর্ডার-বুক্ খানার পাতা পর্য্যন্ত ছিঁড়ে নিয়ে গেছে—এম্‌নি ত্যাঁদোড় সে। আসলে কিন্তু ত্যাঁদ্‌ড়ামি ক’রে এ কাজ সে আদবেই করে নি—অমন হাল্কামির সময় কোথা তার?

তা যদি না করে থাকে তবে নিশ্চয়ই অর্ডার-বুক্‌খানা থেকে এমন একটা কিছু সে ছিঁড়ে নিয়েছে যাতে তার বিশেষ দরকার ছিল। সে জিনিষটা কি? দ্বিতীয় ষ্টোভার ঘড়ির মালিকের নাম-ঠিকানা নয় তো? ব্যাপারটা দেখা দরকার। কৌশলে ঘড়িওয়ালাকে একটু তফাতে পাঠিয়ে খাতাখানা পরীক্ষা করে নিলাম—ভূপেশ বাবুর নাম-ধাম-ওলা পাতাখানা বাস্তবিকই সেখানে রয়েছে, না কি তা' কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। জানি, ভূপেশ বাবু তাঁর ঘড়িটা সারাতে দিয়েছিলেন মাত্র ক'দিন আগে, কাজেই তাঁর নামটা শেষের দিকেই থাক্‌বে। কিন্তু শেষের পাতা ক'খানা খুঁজে খুঁজে কিছুতে তাঁব নাম পাওয়া গেল না; উপরন্তু দেখা গেল সেখানেই একখানা পাতা ছেঁড়া। জিনিষটা তখন অনেকখানি স্বচ্ছ হয়ে এল এবং অজানাতে মুখে হয়তো আমার একটু আনন্দেব ভাবও এসে পড়্‌লো। কিন্তু আপনি ভাব্‌লেন, আমার বুঝি রাজত্ব-লাভ হয়েছে, তাই আমি খুসী হয়েছি। তারপর সব শেষে এখন বাইরে এসে দোকানের কাছে এই পাঁচশো আঠারো নম্বরের ষ্টোভার ঘড়িটী পড়ে থাক্‌তে দেখে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে ভূপেশ বাবুর ঘড়ি মনে করেই এটাকে চোর গোড়াতে সরিয়েছিল, পরে নিজের ভুল বুঝে এখানে ফেলে দিয়েছে,

এবং অর্ডার-বুক্ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আদৎ ঘড়িটার সন্ধান বার করেছে। এ ভিন্ন আসল রহস্যের কোন



আল্‌গোছে ডাষ্ট্‌বিন্ হইতে তুলিয়া ফেলিলেন

মানেই হয় না। দেখুন, এ ঘড়িটা কেমন 'সুস্থশরীরে' রয়েছে, কেউ একটা আঁচড়ও দেয় নি এতে।"

রণজিৎ দম বন্ধ করিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিল, হুকা-কাশি থামিলে পরে কহিল, "আপনি যা বল্‌ছেন তার মানে কিন্তু এই দাঁড়ায় যে চোর ভূপেশ বাবুকে চেনে না, অথচ তাঁর ঘড়িটাকে চেনে।"

"অবিকল! আপনি এবার ঠিক কথা বল্‌ছেন।"

"কিন্তু সে কি করে সম্ভব হয়?"

"ঐখানেই হচ্ছে আসল রহস্য। সে রহস্যের বার আনা ভেদ আমি মনে মনে করে এনেছি, বাকী চার আনা ভেদ না করা পর্য্যন্ত আপনাকে একটু ধৈর্য্য ধর্‌তেই হবে রণজিৎ বাবু!" বলিয়া হুকা-কাশি ছোট্ট একটা কাঠি আল্‌-গোছে ঘড়ির কড়াটাতে বাধাইয়া সেটাকে ডাষ্ট্‌বিন্ হইতে তুলিয়া ফেলিলেন।

—পাঁচ—

দুইজনে মিলিয়া যখন হুকা-কাশির বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন, কলিকাতার গলিতে গলিতে অন্ধকার তখন বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। চলিতে চলিতে হুকা-কাশি একবার পেছনে তাকাইয়া দেখিলেন কেউ তাঁহাদের লক্ষ্য করিতেছে কিনা, কিন্তু সেই জমাট্‌বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে কোন মনুষ্য-মূর্ত্তিই তাঁর চোখে পড়িল না।

নিজের বসিবার ঘরটীতে ফিরিয়া আসিয়া হুকা-কাশি প্রথমেই ঘড়িটীকে আল্‌গোছে টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন; তারপর দরজা বন্ধ করিয়া ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ্‌টী টিপিয়া দিতেই উজ্জ্বল আলোকে ঘরখানা দিনের মত ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। রণজিতের দিকে তাকাইয়া একটী বার মৃদু হাসিয়া হুকা-কাশি তখন কহিলেন, "বিজ্ঞানের দৌলতে দিনে আর রেতে আজকাল তফাৎ নেই কিচ্ছু। উঠে আসুন দেখি এদিকে রণজিৎ বাবু, ঘড়িটাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করে দেখুন তো কিছু নজরে আসে কিনা!"

রণজিৎ আগাইয়া গিয়া ঘড়িটীর প্রতি মিনিট্ কয়েক চাহিয়া রহিল শেষে কহিল, "হ্যাঁ, ষ্টোভার নামটা বেশ স্পষ্টই পড়া যাচ্ছে বটে!"

"ও তো পুরোনো কথা হ'ল। আর নতুন কিছু বল্‌তে পারেন?"

চোখের সাম্‌নে ঘড়িটীকে আনিয়া ধরিবে বলিয়া রণজিৎ হাত বাড়াইতে যাইতেছিল, হুকা-কাশি বাধা দিয়া কহিলেন, "না না হাতে পাবেন না, এই ভাবেই দেখে বল্‌তে হবে!"

রণজিতের মনে পড়িল ডাষ্ট্‌বিন্ হইতে সে যখন ঘড়িটীকে তুলিতে যাইতেছিল তখনও হুকা-কাশি তাহাকে

বাধা দিয়াছিলেন, এখনও দিতেছেন ; নিজেও তিনি ঘড়িটাকে হাতে করিয়া ধরিতেছেন না ! কিন্তু কেন ?

তার মনের ভাব হুকা-কাশি বোধ করি বুঝিতে পারিলেন ; পাশের দেরাজটা খুলিয়া একটা কৌটা হইতে সাদামত কি একটা গুঁড়া বাহির করিয়া সেগুলি ঘড়িটার উপরে তিনি ছড়াইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ঘড়ির উপরকার চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল এবং বিস্মিত রণজিতের চোখে পড়িল ঘড়ির উপর কার যেন বুড়ো-আঙ্গুলের কয়েকটা ছাপ উঠিয়াছে। রবার-ষ্ট্যাম্পের প্যাড্ হইতে আঙ্গুলে কালী মাখাইয়া সেই আঙ্গুল কাগজের উপর চাপিয়া ধরিলে যেমন প্রত্যেকটী রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে ঘড়ির উপরকার ছাপগুলিও ঠিক তেমনই স্পষ্ট।

"দেখ্‌লেন কেমন মজা ! ডাষ্ট্‌বিনে ঘড়িটাকে ফেলে দিয়ে চোর ভেবেছে সে ভারী উৎরে গেছে ; কে আর জান্‌তে যাচ্ছে যে সে-ই সেখানে ঘড়ি ফেলেছে। কিন্তু ঘড়িও যে ওদিকে আবার তার হাতের ছাপ বুকের ওপর ধরে রাখ্‌তে পারে চোরের পো'র বোধ হয় সে-কথা খেয়ালে আসে নি। শুধু এই কারণেই আমি নিজে ঘড়ির ওপর হাত দিই নি, বা আপনাকে হাত দিতে দিই নি। তা দিলে,

নির্ঘাৎ চোরের হাতের দাগ চাপা পড়ে যেত, আর জেগে উঠ্‌তো হয় আপনার হাতের দাগ, আর নয়তো আমার। এটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের হাতের ছাপ ভিন্ন ভিন্ন রকমেব। দুনিয়ায় এই যে এত কোটী কোটী লোক, কিন্তু এম্‌নি আশ্চর্য্য, একজন লোকের হাতের ছাপের সঙ্গে অপর একজনের হাতের ছাপ একেবারেই মিল্‌বে না। দুটো হাতের ছাপ মিলিয়ে অনায়াসে সে হাতের মালিককে চিনে ফেলা যায়। এ রকম ক্ষেত্রে চোরের হাতের ছাপ পাওয়াটা যে আমাদের মস্ত একটা লাভের জিনিষ হয়েছে তা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার কর্‌বেন !" বলিয়া হুকা-কাশি উৎসুকভাবে রণজিতের মুখের দিকে তাকাইলেন।

রণজিৎ কহিল, "হাতের ছাপ থেকে অপরাধীকে খুঁজে বার করা যে সম্ভব তা আমি জানি, মিষ্টার হুকা-কাশি ; কিন্তু তবুও কিছুতেই আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কল্‌কাতার এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে শুধু হাতের ছাপ মিলিয়ে চোর ধর্‌বেন আপনি কি ভাবে !"

এ প্রশ্নের জবাবে হুকা-কাশি হাসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, কল্‌কাতার প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী ঢুকে সবাইকার হাতের ছাপ নেবার প্রস্তাব যদি আমি কর্‌তাম তবে

আপনি আমায় পাগ্‌লা-গারদে পাঠাবার বন্দোবস্ত অনায়াসে কর্‌তে পার্‌তেন, আমি তাতে কথাটী পর্য্যন্ত কইতাম না। কিন্তু তা নয়, ঘড়ি যে সরিয়েছে স্থির জান্‌বেন ঘড়িওয়ালার সঙ্গে তার বেশ ভালমতোই আলাপ-পরিচয় আছে। এ অবস্থায় ব্যাপারটা অনেক খানি সরল হয়ে গেছে...” কথা কয়টী শেষ হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু হঠাৎ যেন তিনি কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন; রণজিৎ চোখ তুলিয়া দেখিল তিনি নিবিষ্টভাবে ঘড়ির উপরে কি একটা দেখিতে স্রুরু করিয়া দিয়াছেন।

একটু পরেই আবার তিনি কথা বলিলেন, কহিলেন, “আচ্ছা, বলুন দেখি রণজিৎ বাবু, প্রত্যেকটা বুড়ো-আঙ্গুলের ছাপের পাশে পাশে আর একটা যে দাগ দেখা যাচ্ছে ওটা কি?”

রণজিৎ দাগটীকে ভাল মতন পরীক্ষা করিয়া বলিল, “ওটা বোধ করি বাকী চার্‌টে আঙ্গুলের কোন একটার দাগ হবে; সবটা আঙ্গুল বসেনি বলে অমন ছোট আর অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।”

“কিন্তু বুড়ো-আঙ্গুল ঐখানে ঐ অবস্থাতে থাক্‌লে অন্য কোন আঙ্গুল তো ওখানে আস্‌তে পারে না রণজিৎ

বাবু, অন্ততঃ আসা স্বাভাবিক নয়।" বলিতে বলিতে অমনি তিনি ঘড়িটী উল্‌টাইয়া ফেলিয়া অপর দিকেও খানিকটা সেই সাদা গুঁড়া মাখাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, "এ পিঠেও দেখুন একই রকম।" তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কথাবার্ত্তায় দু'জনে এমনই মগ্ন হইয়া ছিলেন যে দু'জনার কেহই লক্ষ্য করিলেন না, পিছনের খড়্‌খড়িটির ফাঁক্ দিয়া একজোড়া চোখ অতি সন্তর্পণে তাঁহাদের কাজকর্ম্ম সমস্তই দেখিয়া লইল; শুধু তাই নয়, দু'জনার মধ্যে নিরালায় এবং গোপনে যে কথাগুলি হইল এক-জোড়া কান সেগুলি পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল। হুকা-কাশি এদিকে একটু ফিরিবার উপক্রম করিতেই সেই চোখ ও কানের মালিক দেওয়ালের কোণ্‌টিতে নিজেকে একেবারে মিশাইয়া দিল এবং তার একটু পরেই পা টিপিতে টিপিতে একেবারে রাস্তার অন্ধকারে নামিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে রণজিৎ চোখ মেলিয়া দেখে সূর্য্যের আলো জানালা-দরজার ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে দস্তুরমত উঁকি দিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। তাড়াতাড়ি শিয়রের কাছ হইতে রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌টি তুলিয়া দেখিল বেলা সাড়ে সাতটা। ধড়্‌মড় করিয়া সে উঠিয়া বসিল; বাহিরের

বারান্দায় চাকর আগেই বাল্‌তি ভরা জল রাখিয়া গিয়াছিল, মুখ-হাত ধুইয়া বাহির হইয়া পড়িতে সময় তাহার বেশী লাগিল না। রাস্তায় নামিয়াই সে ধরিল সোজা ডাফ্ ষ্ট্রীটের পথ ; প্রাতে আসিয়া তাঁহার সহিত চা খাইবার জন্য হুকা-কাশি কাল রাত্রেই তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন, চা-পানের পর দুইজন এক সঙ্গে বাহির হইবেন এই রকম কথা আছে।

বীডন ষ্ট্রীটের মোড় ছাড়াইয়া ডাফ্ ষ্ট্রীটে ঢুকিতেই রণজিৎ দেখিল খুব জমকালো আচ্‌কান ও তক্‌মা-পরা এক বিশাল চেহারার ভোজপুরী দরওয়ান একখানা কাগজের স্লিপ হাতে গোটা ফুটপাথ্-ময় কপাটি খেলার মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে ; কোন একটা বাড়ীর ঠিকানা সে চায় অথচ খুঁজিয়া সে তা' বাহির করিতে পারিতেছে না। রণজিৎকে সাম্‌নে পাইয়াই সে আড়াই-গজি এক সেলাম ঠুকিয়া স্লিপের কাগজখানা তাহার হাতে দিল, উদ্দেশ্য বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া সে তাহার এই কপাটি খেলা হইতে তাহাকে মুক্তি দেয়।

উপরের শিরোনামার উপর চোখ পড়িতেই কিন্তু রণজিৎ সচকিত হইয়া উঠিল—হুকা-কাশির নাম ! লোক-টাকে প্রশ্ন করিয়া সে জানিতে পারিল 'নলকোপা-কুঠিসে'

সে আসিতেছে। ইহারই মধ্যে কথা বলিতে বলিতে কোন্ ফাঁকে তার চোখ দুটী যে লেখা কাগজখানার উপর দিয়া চলিয়া গেল তা বোধ করি সে নিজেও টের পায় নাই।



ভোজপুরী দরওয়ান

কিন্তু লেখার মর্ম্মটুকু জানিতে পারিয়া সে এমনই বিচলিত হইয়া উঠিল যে পরের উদ্দেশ্যে লেখা স্লিপখানা পড়া যে তার উচিত হয় নাই—একথা একবারও তার মনে জাগিল

না, পরম আগ্রহভরে দরওয়ানকে সঙ্গে লইয়া হুকা-কাশির বাড়ীর দিকে সে আগাইয়া চলিল। স্লিপ্‌খানায় নীল পেন্সিলে খুব তাড়াতাড়ি মাত্র এই কয়টী কথা লেখা ছিল— "পাখী ধরা পড়িয়াছে, আপনার আসা নিতান্ত দরকার।"

হুকা-কাশির বাড়ীর সামনে আসিয়া রণজিৎ দেখিল দরজা-জানালা সবই ভিতর হইতে বন্ধ। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখে বেলা সাড়ে আট্‌টা বাজিয়া গেছে। খুব ভোরে ঘুম হইতে ওঠা হুকা-কাশির বহুদিনকার অভ্যাস রণজিৎ তা জানিত, তার উপর আবার তিনি তাকে চায়ের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। এত বেলা পর্য্যন্ত তাই দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় সে ভারী আশ্চর্য্য বোধ করিল। ঘরে উঠিয়া সে যে অপেক্ষা করিবে এমন দরজাটি পর্য্যন্ত খোলা নাই। খুব খানিকটা কড়া নাড়িয়াও যখন ভিতর হইতে কোন সাড়া-শব্দ আসিল না, তখন অবাক্ হইয়া রণজিৎ ভাবিতে লাগিল, আজ ইহাদের হইল কি? ভিতরের অবস্থাটা যদি বোঝা যায় এই ভরসায় এদিক্ ওদিক্ সে নানা রকমে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেও কসুর করিল না, কিন্তু সবই বৃথা, বাড়ীতে যে কোন লোকজন আছে কোন প্রমাণই তার পাওয়া গেল না। কি করিবে দাঁড়াইয়া তাই যখন সে ভাবিতেছিল হঠাৎ তখন একটা

কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় ভূপেশ বাবুর দরওয়ানকে সে সেইখানে দাঁড় করাইয়া পাশের একটা সরু গলি দিয়া একেবারে বাড়ীর পেছনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই সবিস্ময়ে দেখে পেছনের দরজা একেবারে সম্পূর্ণ খোলা। সেই খোলা দরজার পথে রণজিৎ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল; তবুও কিন্তু লোকজনের সাক্ষাৎ নাই। ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য সে চট্‌পট্‌ কয়েকটা জানালা খুলিয়া দিয়া শেষে হুকা-কাশির নাম ধরিয়া জোরে কয়েকটা হাঁক ছাড়িল, কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং—না মিলিল হুকা-কাশির জবাব, না তার বেহারা অমৃতের। জবাব মিলিল না বটে, কিন্তু তার যেন মনে হইল পাশের ভাঁড়ার ঘরটি হইতে কেমন একটা হুটোপাটির শব্দ আসিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে দরজা খুলিয়া সেই ঘরে ঢুকিতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়িল বোধ করি তার পায়ের তলাকার মাটি ফাটিয়া দুইভাগ হইয়া গেলেও সে অধিকতর স্তব্ধ হইত না—হুকা-কাশি ও তাঁহার বেহারা অমৃত পাশাপাশি মাটীতে পড়িয়া গড়াইতেছেন; তাঁহাদের হাত-পা মোটা শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধা এবং প্রত্যেকেরই মুখ এমনভাবে আট্‌কান যে কোন প্রকারের বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব।

-ছয়—

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া রণজিৎ সেই ঘরের তাকের



বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব

উপর একখানা সুপারি-কাটা জাঁতি দেখিতে পাইল। পর-মুহূর্ত্তেই সেটার সাহায্যে ক্ষিপ্রহস্তে হাত-পায়ের বাঁধন কাটিয়া সে সভৃত্য হুকা-কাশিকে মুক্ত করিয়া দিল।

ছাড়া পাইয়া প্রথমেই হুকা-কাশি যে কাজটী করিলেন সেটী উল্লেখযোগ্য। ভাঁড়ার ঘরের একপাশে খাবার রাখিবার একটী জালের আল্‌মারী ছিল, তারই সাম্‌নে গিয়া একটী ড্রয়ার তিনি সামান্য একটু টানিয়া কি দেখিলেন ; তারপর ড্রয়ারটী আবার চাবিবন্ধ করিয়া রাখিলেন। পরে কুঁজা হইতে খানিকটা জল নিজের মাথায় ঢালিয়া রণজিতের হাত ধরিয়া সোজা একেবারে বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চেয়ারে বসিতে বসিতে হুকা-কাশি খুব সংক্ষেপে দু'চার কথায় গত রাত্রির একটী বিবরণ দিলেন, কহিলেন, "যত তুচ্ছ ব্যাপারই হোক্ না কেন রণজিৎ বাবু, আমাদের সাবধানতা কোনক্রমেই এতটুকু কম্‌তে দিতে নেই। এ কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বেন। সামান্য একটু সময়ের জন্য এ কথাটাকে তেমন আমলে আনিনি বলে এই দারুণ নির্য্যাতন আমাদের ভোগ কর্‌তে হোল। তবে বেশীদূর ব্যাপারটা গড়াতে পারে নি এই যা রক্ষা!"

অধীর ভাবে রণজিৎ প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছিল মিষ্টার হুকা-কাশি? সবটা ব্যাপার আমায় খুলে বলুন!"

"খুলে বল্‌বার বড় বেশী কিছু নেই ; শুধু এইটুকু

জান্‌বেন যে কাল ঘড়ি-ওয়ালার দোকান থেকে বার হয়ে এই বাড়ীতে এসে পৌঁছাবার পথে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ অজানাতে ঘড়ি-চোরের চোখে পড়ে গেছি। এই চোখে পড়ায় অবশ্য ক্ষতি কিছুই হোত না যদি না এরই মধ্যে সে টের পেয়ে যেত যে আমরা লোক বড় সুবিধের নই, তাকে খুঁজে বার করবার ফন্দি-ফিকিরেই ঘুর্‌ছি। পাঁচশো আঠারো নম্বরের ঘড়িটা আমার হাতে আসাতে অপরাধীকে আঁচ্‌বার কাজ কত সোজা হয়ে গেছে আপনি তা এখনো সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারেন নি—পরে বুঝ্‌বেন। এখন সেটা বুঝ্‌ছি মাত্র আমরা দু'জন লোক—আমি আর সেই ঘড়ি-চোর নিজে। মুহূর্ত্তের ভুলে ঘড়িটা ডাষ্ট্‌বিনে ফেলে এখন সে পস্তাচ্ছে। ঘড়িটা যতক্ষণ আমার কাছে ততক্ষণ তার মানসিক উদ্বেগের সীমা থাকৃতে পারে না, তাই ঘড়িটা সরাবার মৎলবেই কাল সে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে—এবং সে সাঙ্গপাঙ্গদের দেখে আমার ধারণা হোল তারা ভাড়াটে গুণ্ডা—আমার বাড়ীতে এসে হানা দিয়েছিল। তার পরের ঘটনা বোধ হয় আর না বল্লেও চলে, ভাঁড়ার ঘরে আমাদের কীচক-বধের মত দশা দেখে আপনি তা অনুমান করে নিয়েছেন। কিন্তু…"হুকা-কাশি একটু থামিলেন, তারপর দম লইয়া আবার বলিতে সুরু করিলেন, "কিন্তু

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। ছাড়া পেয়ে গোড়াতেই ভাঁড়ার ঘরে জালের আলমারীর দেরাজটা খুলে দেখলাম আমার গুপ্ত স্থানের সন্ধান তারা পায়নি, ঘড়িটা নিরাপদে সেই দেরাজের ভেতরেই রয়েছে।"

এতক্ষণ পরে রণজিৎ উৎসাহ-প্রকাশের অবকাশ পাইল, বলিল, "ঘড়ি নিরাপদে আছে, ওদিকে আবার চোর মশাই বড়ই বিপদে পড়েছেন—একেবারে ভূপেশ বাবুর মুঠোর ভেতর! এই দেখুন…" বলিয়া রণজিৎ দরওয়ানের দেওয়া সেই কাগজের স্লিপ্‌টুকু হুকা-কাশির চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল।

কাগজখানা রণজিতের হাত হইতে নিজের হাতে লইয়া হুকা-কাশি বার দুই তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেলেন। তাঁহাকে একটু চিন্তাযুক্ত দেখাইল। ক্ষণকাল আত্মস্থ হইয়া নিমীলিত চোখে একটিপ নস্য লইতে লইতে তিনি কি যেন একটু ভাবিলেন, তারপর রণজিতের দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন। তাঁহাকে ওভাবে হাসিতে দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বরে রণজিৎ কহিল, "আপনার কি বিশ্বাস ভূপেশ বাবু ভুল করেছেন, আসল চোর ধরা পড়েনি?"

"আমার মনের ভাব আপনি ঠিক অনুমান করেছেন রণজিৎ বাবু।"

"কিন্তু তবুও ভূপেশ বাবু যখন এতটা জোর করে লিখ্‌ছেন তখন তাঁর ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা অন্ততঃ পরীক্ষা করাও আমাদের উচিত নয় কি ?"

"নিশ্চয়ই, তাঁর ওখানে যেতে হবেই তো! যদিও আমার মন বল্‌ছে ভূপেশ বাবুর বাড়ী না গিয়ে ভবানীপুরে আমার সেই বোটানীর প্রোফেসার বন্ধুটীর বাড়ী গেলে তাতে করে আসল কাজ অনেক এগিয়ে যাবে, তবুও ভূপেশ বাবুর সম্মান রাখ্‌বার জন্যে তাঁর ওখানে গোড়াতে যাওয়াই সব চাইতে দরকার!"

"বোটানীর প্রোফেসার-বন্ধু ? তিনি এ ঘড়ি-চুরির বিষয় কি জানেন ?"

"কিছুই না।"

"আমায় মাপ কর্‌বেন, আপনার এ হেঁয়ালির মানে বোঝা আমার ঠাকুরদারও অসাধ্য।"

হুকা-কাশি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তারপর কহিলেন, "একটু ধৈর্য্য ধরুন, আস্তে আস্তে সমস্তই একেবারে জল হয়ে আস্‌বে। অবশ্য ধৈর্য্য ধরে থাকা যে খুবই কঠিন তা আমি বুঝি। এই ধরুন, প্রোফেসার

গুপ্তের ছেলে বিমল বাবুকে তো সেদিন অত করে বলে দেওয়া হোল যে আমরাই তাঁকে খবর পাঠাব তবুও তিনি সুস্থচিত্তে থাকতে পারলেন কই! কাল এখান থেকে আপনি বিদায় নেবার পরেই তিনি বিরূপাক্ষ বাবুকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত। ভাল কথা, আহা হা, বেচারা বিরূপাক্ষ বাবুর একটা বড় য়্যাক্‌সিডেণ্ট্‌ হ'য়ে গেছে, জানেন নাকি?"

"য়্যাক্‌সিডেণ্ট্‌? না, কই কিছুইতো জানিনা আমি!"

"চল্‌তি বাস্‌ থেকে নাম্‌তে গিয়ে বেচারা বড়ই চোট্‌ পেয়েছে। সব চাইতে বেশী লেগেছে হাঁটুর ওপরে আর ডান হাতের কব্জিতে। আঘাতটা বাস্তবিকই গুরুতর হয়েছে—ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ্‌ বেঁধে গলার সঙ্গে ফালি দিয়ে হাতটা ঝুলিয়ে দিয়েছে।...যাক্‌, সে সব কথা বিতং দিয়ে বল্‌তে গেলে ঢের সময় লাগবে। চায়ের বন্দোবস্ত এখন আর বাড়ীতে করা সম্ভব হবে না, তা'হলে বড়ই দেরী হয়ে পড়্‌বে। পথে চল্‌তে চল্‌তে একটু ভদ্রগোছের দোকান থেকে ও কাজটা সেরে নেওয়া যাবে।"

ভূপেশ বাবুর বাড়ীর সদর দরজা পার হইয়া একটু অগ্রসর হইতেই তাঁহারা দেখিলেন কর্ত্তা স্বয়ং অধীর ভাবে

সামনের বারান্দার এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং ঘন ঘন হাত-ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি নজর পড়িতেই তিনি সাগ্রহে কহিলেন, "এই যে এসেছেন আপনারা! আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনাদেরই অপেক্ষায় বসে রয়েছি।" তারপর তাঁ'রা আরও একটু নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, "ঘড়ি-চোরের সন্ধান মিলেছে মিষ্টার হুকা-কাশি। আপনার মনে থাকা সম্ভব প্রথম দিনই নলকোপার একটি লোকের নাম আমি উল্লেখ করে বলেছিলাম যে সে আমার বাবাকে তার জীবনের সব চাইতে বড় শত্রু বলে ঠাউরে বসে আছে। এ পৃথিবীতে বাবার কোন স্মৃতিচিহ্নই সে রাখতে দেবে না। সেই জন্যেই যখন অত খরচ-পত্র করে তাঁর ওয়াটার-পেন্টিংটা নলকোপায় পাঠালাম তখন জুতোর ঠোক্কর মেরে সেটাকে গুঁড়ো করে দিতে তার এতটুকু বাধেনি। তাঁর শেষ চিহ্ন ষ্টোভার ঘড়িটাও গভীর রাতে এসে সে-ই গুঁড়ো করে রেখে গেছে। ওঃ, প্রতিহিংসা মানুষকে এমনই জঘন্য আর হীন করে ফেলে!" একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "এই পাশের ঘরেই তাকে আটকে রাখা হয়েছে।"

হুকা-কাশি নিবিষ্টমনে সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া কহিলেন "কিন্তু এই লোকটিই যে ঘড়ি সরিয়েছে এ রকম মনে কর্‌বার হেতু কি ?"

"প্রমাণ রয়েছে—এবং সে প্রমাণ একেবারে অকাট্য। কাল সন্ধ্যের একটু পরে আমার দরওয়ানটাকে পিওন-বুক দিয়ে মিনিট পনেরোর জন্য একটা জরুরী কাজে পাঠাতে হ'ল। এই পনেরো মিনিট্ কাল দেউড়ি একেবারে খালি ছিল। ঠিক এম্‌নি সময় আমার ভাগ্নে বিনোদ বাইরে কোথায় বার হচ্ছিল, তার যেন মনে হ'ল কম্পাউণ্ডের ভেতর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটা লোক অনিমেষ চোখে আমার বাড়ীর দিকে চেয়ে আছে। লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি সে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। নিশ্চয় সে ভেবেছিল বিনোদের নজর অন্ধকারে অতদূর অবধি পৌঁছোবে না, সদর ফটক দিয়ে সে বেরিয়ে গেলে অনায়াসেই আবার তার আগেকার জায়গাটাতে ফিরে আস্‌তে সে পারবে। বিনোদের কিন্তু মনে একটা কেমন খট্‌কা লাগায় পা টিপে টিপে সন্তর্পণে তারই দিকে সে এগিয়ে চল্ল। বেগতিক দেখে লোকটা তখন প্যারাপেট্ ডিঙ্গিয়ে চোঁ চা দৌড়! কিন্তু বাছাধন ভুলে গিয়েছিলেন যে সহরটা নল্‌কোপা নয়, কল্‌কাতা ; 'চোর' বলে সজোরে

একটা হাঁক্ দিলেই তখুনি ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে তাকে ঘিরে ফেল্‌বে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সবাই তাকে হিড়্ হিড়্ করে টেনে এনে আমার সমুখে হাজির করলে। মুখের পানে চেয়েই টের পেলাম মূর্ত্তিমান্‌টি কে! অনেক করে তাকে জিজ্ঞাসা করা হোল কেন সে চুপি-চুপি আমার বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরছিল, আর বিনোদকে দেখে অমন পালাতেই বা গেল কেন। কিন্তু কোন কথার জবাবই সে দিলে না, মুখ বুঁজে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিনোদ ছাড়্‌বার পাত্তর নয়, নানা ভাবে তাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে লাগল—ট্যাঁকে কিছু গোঁজা আছে কিনা, জামার পকেটে কিছু রয়েছে কিনা। জামার পকেটে হাত দিতেই কিন্তু যে জিনিষ বেরিয়ে এল তা শুনলে আপনারাও স্তম্ভিত হয়ে যাবেন—একখানা ভাঁজ করা কাগজ, তার ভেতর লেখা "ষ্টোভার ঘড়ি। মেরামৎ করতে দেওয়া …নং…ষ্ট্রীটে।" আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে মিষ্টার হুকা-কাশি যে ষ্টোভার আমারই ঘড়ির নাম এবং নম্বরটাও সেই দোকানেরই নম্বর যেখানে আমি আমার ঘড়ি সারাতে দিয়েছিলাম। আমার কাছ থেকে ক্যাশমেমো চেয়ে নিয়ে আপনি সে দোকানের ঠিকানা দেখে নিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটা তখন এক নিমেষে জলের মত সোজা হয়ে এল;

নিশ্চয়ই এ লোকটা কোন রকমে টের পেয়ে থাক্‌বে যে বাবার ষ্টোভার ঘড়ি আমি অমুক দোকানে সারাতে দিয়েছি। মৎলব ছিল তার দোকান থেকেই ঘড়িটা সরানো কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি, সে যাবার আগেই আমি ঘড়ি ফিরিয়ে এনেছিলাম ; কাজেই দোকানে যা সে পায়নি, গভীর রাত্রে আমার শোবার ঘরে ঢুকে দেরাজের ভেতরে অনায়াসেই তা পেয়েছে। এই লোকটাই যে ঘড়ি চোর সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাক্‌তে পারে না।”

রণজিৎ আড়্‌চোখে একবার হুকা-কাশির দিকে তাকাইয়া দেখিল মুখের ভাব তাঁর কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা, কিন্তু সে প্রশান্ত মহাসাগরে ঢেউয়ের লীলা কেউ কখনো বুঝিতে পারে না, রণজিৎও পারিল না। স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া তিনি ভূপেশ বাবুকে তাঁহার বর্ণনা শেষ করিতে দিলেন, তার পর মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, “লোকটাকে ছেড়ে দিলেই ভাল কর্‌তেন কিন্তু। কোথায় সে? চলুন একবার তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব।”

একটু বাদেই তাঁদের দুইজনকে সঙ্গে লইয়া ভূপেশ বাবু ছোট একটা কুঠুরীতে ঢুকিলেন। ঘরের এক কোণায়

বেঞ্চির উপর লোকটি বসিয়া ছিল ; বয়স তাহার পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নর কম নয় ; সমস্ত মুখ খানায় দারিদ্র্যের ছাপ মাখানো, কিন্তু চোখ দুটি উজ্জ্বল। মিনিট্ খানেক হুকা-কাশি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি এমনি তীব্র যে মনে হইল বুঝি তাহা তাহার অন্তর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সে খুব অল্প ক্ষণের জন্য। তার পরেই হুকা-কাশি তাঁহার চোখ নামাইয়া আনিলেন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া লোকটির পাশে, সেই বেঞ্চির উপরই বসিয়া পড়িলেন।

ভূপেশ বাবুও হুকা-কাশির সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিলেন, বলিলেন, "যাই বলুন মশাই, ভদ্দরলোকের কল্পনা-শক্তির তারিফ্ করতে হবে, সময়ে চেষ্টা করলে গল্প-লিখিয়ে হিসেবে ইনি রবি-ঠাকুর, শরৎ-চাটুয্যেকেও ছাড়িয়ে যেতেন। উঃ, গল্প বানাবার কি শক্তি! জিজ্ঞাসা করা হোল, 'ও কাগজখানা আপনার পকেটে এল কি করে ?' তা বল্লে কি জানেন ? বল্লে, নলকোপার কে নাকি দিন পনেরো কুড়ি আগে একবার কল্‌কাতা এসেছিল, তখন সে তার ষ্টোভার ঘড়িটা ওই দোকানে মেরামৎ করতে দিয়ে যায়। ঘড়ি সারাতে দিয়ে সে বাড়ী

চলে গিয়েছিল, ইনি কল্‌কাতা আস্‌ছেন শুনে ঘড়িটী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বরাত একে সে দিয়েছে। তাই শুনে বিনোদ ফের জিজ্ঞাসা করলে, 'তা সে ঘড়িটা কোথায়, দেখি!' তার জবাব হোল—সে ঘড়ি আর দেখাবার উপায় নেই, কেননা ঘড়িওয়ালা বলেছে তার দোকান থেকে সেটা নাকি চুরি গেছে। কেমন! চেষ্টা করলে ইনি বড় নভেলিষ্ট্ হতে পারতেন না? কি মনে হয় আপনার?"

এবার আড়্ চোখে চাহিবার পালা হুকা-কাশির, বণজিতের দিকে তিনি একটী চোরা চাহনি হানিয়া হাসিয়া কহিলেন, "না ভূপেশ বাবু, শুধু এর থেকেই এঁকে আমি বড় নভেলিষ্ট্ বলে মেনে নিতে রাজী নই, কেননা ইনি যা বলেছেন তা এঁর বানানো গল্প নয়, সেটা একটা সত্যি ঘটনা। বাস্তবিকই ওই ঘড়ি-ওলার কাছে আরও একটী ষ্টোভার ঘড়ি মেরামৎ হতে এসেছিল এবং বাস্তবিকই সে ঘড়িটী খোয়া গেছে। সে ঘড়ি দেখাবার এঁর আর কোনই ক্ষমতা নেই তবে আপনি সেটা দেখ্‌তে চান্ তো আমি তা দেখাতে পারি, কেননা বর্ত্তমানে আমার কাছে সেটা রয়েছে। এর ওপরেও যদি আপনি আরো প্রমাণ চান তবে জেনে রাখুন যে আপনার ঘড়ি-চোর কাল

রাত-দুপুরে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আমার বাড়ী চড়াও করেছিল, আমাকে আর আমার বেয়ারাকে ভাঁড়ার ঘরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছিল ; আজ ভোরে রণজিৎ বাবু গিয়ে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন।

—সাত—

স্তব্ধ হইয়া ভূপেশ বাবু কহিলেন, "আপনার বাড়ীতে হানা ? খোদ্ সিংহের বিবরে ?"

"হ্যাঁ, এবং 'সিংহ' একেবারে দস্তুর-মত কুপোকাৎ! তা যাক্ সে সম্বন্ধে আলোচনা বরং এখন স্থগিত থাক্, কেননা শীগ্‌গিরই আমায় একবার ভবানীপুরে আমার এক প্রোফেসার-বন্ধুর বাড়ী পৌঁছাতে হবে, দেরী হ'লে তিনি আবার বালীগঞ্জের ল্যাবরেটারীতে বেরিয়ে পড়্‌বেন ; সেখানে অনেক লোক, গোপনে কথাবার্ত্তা কইবার তেমন জুৎ হবে না" বলিয়া হুকা-কাশি নলকোপাব সেই শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এবার দু'কথায় আপনার বক্তব্যটা সারা করে ফেলুন দেখি। আপনাকে অন্যায় ভাবে আটক রাখা হয়েছে জেনে ভূপেশ বাবু অবশ্যই খুব লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়েছেন তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু ব্যাপার এতটা গড়িয়েছে শুধু আপনারই

অদ্ভুত আচরণের ফলে। কেনই বা আপনি অন্ধকারে বাগানের এক কোণ্‌টীতে অমন চুপি-চুপি এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর কেনই বা লোক আস্‌তে দেখে অমন তাড়াতাড়ি সরে পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন?"

হুকা-কাশি আসিবার পর লোকটী এই প্রথম মুখ খুলিল, কহিল, "হ্যাঁ, আমারই অবিবেচনা বটে।" তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "কতগুলো কারণেতে ভূপেশের বাপের ওপর আমার দারুণ আক্রোশ ছিল, শুধু আক্রোশ নয়—ভূপেশ, তুমি কিছু মনে ক'র না—প্রবল ঘৃণাও ছিল। কিন্তু রাগের বশে এবং সাময়িক উত্তেজনায় একদিন এমন একটা কাজ আমি করে বস্‌লাম যে সে কথা মনে কর্‌তে আজও লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে আস্‌ছে।"

"মৃত ব্যক্তির ছবি লাথি মেরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন, এই তো?"

"হ্যাঁ। স্থির জান্‌তাম, এ ব্যাপারের পর ভূপেশ আর কিছুতেই আমায় ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বে না, তাই এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে ওতে আমাতে কিছুতেই যাতে আর দেখা-সাক্ষাৎ না হয় সেই ভাবে চলে এসেছি। কিন্তু এই দিন কয়েক হ'ল আমি কল্‌কাতা এয়েছি; এর

আগেও যে এখানে আর কখনো আসিনি তা নয়, কিন্তু সে খুব কম, বোধ করি গুণে বলা যায় ক'বার। দেশে থাক্‌তেই শুনেছিলাম, ভূপেশ নাকি কল্‌কাতায় এক বিরাট্‌ বাড়ী করেছে। সে নাকি একটা দেখ্‌বার জিনিষ। ভাব্‌লাম, বাড়ীটা এবার দেখে যেতে হবে। নির্জ্জনে এ কাজটা সার্‌বার পক্ষে সন্ধ্যের পরটাই হচ্ছে সব চাইতে ভাল সময় তা বোধ হয় অস্বীকার কর্‌বেন না। অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌তেই তাই ধীরে ধীরে কম্পাউণ্ডের ভেতরে একটু ঢুকে বাড়ীখানার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম—হাঁ বাড়ী বটে একখানা! হঠাৎ সেই সময়ে কে একজন ভেতর থেকে বেরিয়ে আমারই দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। আমি দেখ্‌লাম আমার পক্ষে এবার সরে পড়াই মঙ্গল, কেননা এর পর হয় তো আমার পরিচয় আর গোপন রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু কল্‌কাতার রাস্তায় আচম্‌কা দৌড়ে পালানো যে এত বড় বিপদের ব্যাপার তা কি তখন ঘুণাক্ষরেও জান্‌তাম্‌—পিঠ্‌টা এখন পর্য্যন্ত টনটনিয়ে রয়েছে।"

বৃদ্ধের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই দু'জনে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। হুকা-কাশি বিপরীত দিকের রাস্তা ধরিয়া কহিলেন, "আপনাকে

আর রোদের ভেতর টান্‌বার বড় ইচ্ছে নেই, রণজিৎ বাবু, আপনি বরং এইবার বাড়ী ফিরুন, আমি আস্তে আস্তে ভবানীপুরের দিকে এগোই।”

“কিন্তু কেন মিষ্টার হুকা-কাশি? বোটানীর অধ্যাপক মশাই আপনাকে এ ব্যাপারে কি ভাবে সাহায্য করতে পাবেন আমি তো ধারণাই কর্‌তে পার্‌ছি না!”

হুকা-কাশি অন্য কি একটা বিষয় চিন্তা করিতে-ছিলেন, কথাটা তাঁর কাণে গেল কিনা ঠিক বোঝা গেল না, তিনি আচম্‌কা প্রশ্ন করিলেন, “ঘড়ির ও দাগগুলো দেখে আপনার কি কোন কথাই মনে উঠছে না রণজিৎ বাবু?”

রণজিৎ ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত কহিল, “কোন্ দাগ-গুলোর কথা বল্‌ছেন?”

“কাল রাত্রে আপনাকে দেখালাম না যে চোরের হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপগুলোর পাশে পাশে কেমন একটা অস্পষ্ট দাগ পড়েছে—যেমন ঘড়ির এপিঠে তেম্‌নি ওপিঠে! এখন কথা হচ্ছে, অতগুলো জিনিষের দাগ ঘড়ির গায়ে এল কি করে? আর কেমন অস্পষ্ট দাগগুলো দেখেছেন!”

একটু দূরেই দেখা গেল কালীঘাটের ‘বাস’ আসিতেছে,

কাজেই আলোচনাটা সেইখানেই তখনকার মত বন্ধ করিতে হইল। হুকা-কাশি ইঙ্গিতে 'বাস্' থামাইয়া তাহাতে গিয়া উঠিলেন, রণজিৎ ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে রওয়ানা হইল।

নানা জায়গা হইতে দিন কয়েক যাবৎ কতগুলি চিঠি-পত্র আসিয়া জড় হইয়া ছিল, ঠিক ছিল খাওয়া-দাওয়ার পর রণজিৎ আজ সেগুলির জবাব লিখিতে বসিবে। এই জবাব দিতে বসিয়াই সারা দুপুরটা তার কোন্ ফাঁক দিয়া যে চলিয়া গেল বিকাল হইবার পূর্ব্বে সে তার কিছু ঠিক-ঠিকানাই পাইল না। হাতের কাজগুলি সারিয়া কাগজ-পত্র গুছাইতে গুছাইতে চাকরকে চা আনিবার জন্য সে যখন হুকুম দিল বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়া গেছে। চা-পানান্তেই রণজিৎ বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল; বড় রাস্তা দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ক্রমে সে সেই মোড়টির নিকট আসিয়া পৌছিল যেখানে ঘড়ির দোকানটী অবস্থিত। কয়েক পা অগ্রসর হইলেই প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ী। রণজিতের মনে হইল প্রোফেসার-পুত্র বিমলের সহিত একবার দেখা করিয়া তাহার পিতা বর্ত্তমানে কেমন আছেন সে খবরটা লওয়া বরং মন্দ নয়। এই উদ্দেশ্যেই সে একটু আগাইয়া বাহিরের ফটকটা পার

হইয়া অধ্যাপক মশা'য়ের বাড়ীর বারান্দায় গিয়া উঠিল। সাম্‌নের ঘরটিতে দুটী লোক কি একটা বিষয় নিয়া উচ্চ কণ্ঠে আলোচনা করিতেছিল ; তার দু' একটা কথা কাণে আসিতেই রণজিৎ বুঝিল প্রোফেসার গুপ্তের রহস্য-জনক উন্মাদ রোগ লইয়াই আলোচনা চলিতেছে এবং সে আলোচনা চালাইতেছে বিমল ও বিরূপাক্ষ আচার্য্য। বিরূপাক্ষ বাবু সান্ত্বনার সুরে বিমলকে বুঝাইতেছিলেন যে সে নিরর্থক অমন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—স্বনাম-ধন্য হুকা-কাশি নিজমুখে যখন একবার আশ্বাস দিয়াছেন যে ব্যাপারটার কিনারা তিনি করিবেনই তখন কিনারা একটা হইবেই।

"ভেতরে আস্‌তে পারি কি ? রণজিৎ বাহির হইতে প্রশ্ন করিল। বিরূপাক্ষ গলা বাড়াইয়া দেখিল রণজিৎ। মুখখানা তার স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া উঠিল, সে কহিল, "এই যে আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। এক্ষুণি আপনাদের কথাই হচ্ছিল ; আমার কিন্তু একটু ছোট্ট নালিশ আছে রণজিৎ বাবু, আপনারা এবার একটু গা' কর্‌তে সুরু করুন, অধ্যাপক মশা'য়ের ব্যাপারটা একেবারে মিইয়ে এল যে !"

প্রত্যভিবাদনপূর্ব্বক একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া

পড়িতে পড়িতে রণজিৎ বলিল, "হ্যাঁ, গা করতে এবার সুরু করব বই কি ? কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, মিষ্টার হুকা-কাশি অন্য একটা জটিল ব্যাপার নিয়ে বড় মেতে গেছেন, সেটার একটু মীমাংসা করে আনতে পারলেই আপনাদের এটাতে হাত দেবেন। তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রোফেসার গুপ্তের এ ব্যাপারের কোথাও যদি এতটুকু রহস্য থেকে থাকে তবে ঠিক্ তিনি তা টেনে বার করবেন..." তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার কহিল, "যদিও আমার নিজের কিন্তু বিশ্বাস অতিরিক্ত মানসিক মেহনতের জন্যেই তাঁর স্নায়ুর কোথাও কিছু হয়ে থাকবে যার ফলে এ বিষম বিপত্তিটি ঘটেছে।"

বিমল এ কথার কোনই জবাব দিল না, গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিরূপাক্ষ বাবু কহিলেন, "কিছুই জোর করে বলা চলে না রণজিৎ বাবু, ব্যাপারটা যতই তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছি কূলকিনারা যেন কোথাও পাচ্ছি না। উঃ"...

অন্যমনস্কভাবে টেবিলের সহিত ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটার একটা গুঁতা লাগিতে বিরূপাক্ষের মুখ দিয়া যন্ত্রণা ব্যঞ্জক এই শব্দটী বাহির হইয়া পড়িল। বিমল এবং রণজিৎ

উভয়েই ত্রস্ত হইয়া উঠিল, রণজিৎ কহিল, "মিষ্টার হুকা-কাশির মুখে আজ প্রাতেই আপনার য়্যাক্সিডেণ্টের কথা শুন্ছিলাম, বড্ড বেশী চোট্ লেগেছে, নয় ?"

"চোট্ ?" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিরূপাক্ষ জবাব দিলেন, "কব্জিটা যেন নেই বল্লেই চলে !" তারপর একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "শাস্ত্রে আছে 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা'—এতটুকু বয়েস থেকে কল্‌কাতা-বারাকপুর ডেলি-প্যাসেঞ্জারি কর্‌ছি, চল্‌তি ট্রেণে ওঠানামা হরদম্ অভ্যাস্। বিশ্বাস ছিল, আপনাদের মত খেলোয়াড় হই আর নাই হই, এ বিষয়টাতে অন্ততঃ সবার ওপরেই টেক্কা মার্‌তে পারি। তারই ফল একেবারে ভগবান্ হাতে হাতে দেখিয়ে দিলেন। নিতান্ত অজ-পাড়াগেঁয়ের মত 'বাস' থেকে পড়ে পঙ্গু হতে হ'ল !"

প্রোফেসার গুপ্তের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তত্ত্ব লইয়া বিমল ও বিরূপাক্ষের নিকট রণজিৎ সেদিনকার মত বিদায় লইল; বোধ করি সর্ব্ব সাকল্যে পনেরো মিনিটের বেশী সময় সে সেখানে থাকে নাই। রাস্তায় নামিয়া সে নিজের চিন্তায় নিশ্চয়ই নিতান্ত বিভোর হইয়া থাকিবে, নতুবা একটী ব্যাপার কিছুতেই তার চোখ এড়াইত না, যে ব্যাপারটী ক্ষুদ্র হইলেও কিছু গুরুতর—

পূর্ব্ব-কথিত ঘড়ির দোকানটার ঠিক পাশে নিজের শরীর-টিকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া বাজ-পক্ষীর মত খর দৃষ্টিতে একটী লোক প্রোফেসারের বাড়ীর ফটকটীর দিকে তাকাইয়া আছে। লোকটা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী, দেখিলে কোন বাড়ীর চাকর-দরওয়ান বলিয়া বোধ হয়। ফটক দিয়া রণজিৎকে বাহির হইতে দেখিয়াই সে শশব্যস্তে দুই পা সরিয়া আসিল, তারপর হঠাৎ ধূলামাখা ফুট্‌পাথের উপরেই ধপ্‌ করিয়া বসিয়া এম্‌নি নিবিষ্টভাবে হাতের তেলোর উপর 'খৈনি' ডলিতে সুরু করিল যেন পৃথিবীতে ঐ একটী মাত্র বস্তুই সে সার বুঝিয়াছে অপর কাজ-কর্ম্ম সমস্তই মায়া। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে রণজিৎ তাহার পাশ কাটাইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল তৎক্ষণাৎ সে তড়াক্‌ করিয়া লাফাইয়া উঠিল; হাতের খৈনি তাহার ফুট্‌পাথের উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, অতি সন্তর্পণে নিজেকে গোপন রাখিয়া রণজিতের পিছু পিছু সে হাঁটা আরম্ভ করিল।

পথ চলিতে চলিতে রণজিৎ দু' একবার পিছনে যে না ফিরিয়াছে এমন নয়, লোকটী তার নজরেও আসিয়াছে কিন্তু তবুও ঐ তেল-চিট্‌চিটে কোর্ত্তা পরা ছাতুমার্কা লোকটা যে কোন উদ্দেশ্য লইয়া তাহার পেছু পেছু আসিতে পারে

এ সম্ভাবনা একবারও তার মনে আসে নাই। ব্যাপার কিন্তু ক্রমে এমনই গড়াইতে আরম্ভ করিল যে সে সন্দেহও



অতি সন্তর্পণে……

ধীরে ধীরে তার মনে উঁকি দিতে কসুর করিল না—যত

বারই সে আড়চোখে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায় ততবারই দিব্যি দেখিতে পায় ছায়ার মত লোকটী অনবরত কেবল তাহারই পিছনে পিছনে আসিতেছে। তাহাকেই অনুসরণ করা লোকটার সত্যিকার উদ্দেশ্য কিনা পরখ্ করিবার জন্য রণজিৎ কারণে অকারণে নানা গলি-ঘুঁজি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু নাঃ, এ সন্দেহ অকাট্য, নিতান্ত বালক ভিন্ন কেহই ইহা অস্বীকার করিবে না যে তাহারই তাকে তাকে লোকটী আসিতেছে। রণজিতের মনে পড়িল হুকা-কাশি বলিয়াছেন চোর ঘড়িওয়ালার নিতান্ত পরিচিত—এ লোকটাকেও তো খানিক আগে ঘড়ির দোকানেরই ঠিক সাম্নে ফুট্পাথের উপর বসিয়া থাকিতে সে দেখিয়াছে! তাহার আরও মনে পড়িয়া গেল, সে নিজেও তো ঘড়ি-চোরের নিকট আর অপরিচিত নয়, সে যে তাহাকে আর হুকা-কাশিকে কাল রাত্রে একত্র দেখিয়াছে—ভূপেশ বাবুর বাড়ীর চুরি সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করিতে শুনিয়াছে। সে ক্ষেত্রে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য লইয়া চোরের পক্ষে তাহার পিছু লওয়া অসম্ভব তো নয়ই, বরং সেইটাই আরো বেশী মাত্রায় সম্ভব।

সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে রণজিতের মাথা গরম

হইয়া উঠিল, সাম্‌নে দিয়া একখানা বাস্ যাইতেছে দেখিয়া সে এক লাফে তাহাতেই চড়িয়া বসিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই বিস্ময় তার একেবারে চরমে গিয়া উঠিল এই দেখিয়া যে হিন্দুস্থানীটা পিছন হইতে হাত তুলিয়া বাসের কণ্ডাক্টরকে থামিতে বলিতেছে। গাড়ী থামিলে সেই ছাতুমূর্ত্তি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া এমন একটী জায়গায় বসিয়া পড়িল যেখান হইতে রণজিতের মুখের উপরে পূর্ণ দৃষ্টি সে রাখিতে পারে। তার পর স্বচ্ছন্দচিত্তে সাম্‌নের বেঞ্চিটীতে ঠ্যাং দুটী তুলিয়া দিয়া নিজের মনে ভাঙ্গা গলায় সে জুড়িয়া দিল একেবারে সঙ্গীত। বোধ হয় উদ্দেশ্যটা এই যে, এবার রণজিৎ তাহাকে সদ্য বিহার হইতে আম্‌দানী মনে না করিয়া আর যায় কোথা ?

গ্রে-ষ্ট্রীটের মোড়ে রণজিৎ বাস্ হইতে নামিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন একটী গলির রাস্তা ধরিল, কিন্তু পিছন ফিরিয়া যখন সে দেখিল সেই মূর্ত্তি সমানে তার পিছনে লাগিয়াই আছে তখন ধৈর্য্য ধরা তার পক্ষে আর অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। ঠিক করিল এস্‌পার ওস্‌পার একটা কিছু এখনই সে করিয়া ফেলিবে, এমন সংশয়ের দোলায় দুলিতে থাকা অসম্ভব। সে যা' মনে করিতেছে বাস্তবিকই

এ লোক যদি তাই হয় তবে বাংলা মুলুকের সবল বাহুর আস্বাদ কাহাকে বলে সে আজ তাহাকে তা' ভাল মতেই বুঝাইবে। শত্রুপক্ষকে একটুও সময় দেওয়া হইবে না ভাবিয়া চলিতে চলিতেই সে মাল্‌কোছাটা মারিয়া লইল্। তার পর সিংহ-বিক্রমে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াই সে একেবারে থতমত খাইয়া গেল। মনে হইল আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ক্রিয়া বুঝি তার চোখের সাম্‌নেই ঘটিয়া গিয়াছে, নতুবা এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে লোক সমানে আসিতেছিল হঠাৎ ভোজ-বাজীর মত সে অদৃশ্য হইয়া গেল কিরূপে? রণজিৎ একটু আগাইয়া এদিক্-ওদিক্ ফিরিয়া দেখিল—হ্যাঁ, সত্যই অনুসরণকারী অন্তর্হিত হইয়াছে, কোথাও তার টিকিটিরও আর দেখা নাই।

—আট—

ঘণ্টা দুই পরের কথা, রাত আট্‌টা বাজিয়া গেছে। একে কৃষ্ণ পক্ষ, তার উপর সারা পল্লীটাতেই রাস্তায় আলোর সংখ্যা কিছু কম; কাজেই পাড়া একেবারে নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিতে যে লোকটী ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া প্রত্যেকটী বাড়ী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল, একটু ভাল করিয়া

নজর করিলে চিনিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবার কথা নয় যে এ সেই হিন্দুস্থানীটি কিছু পূর্ব্বেই রণজিৎকে যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল।

চলিতে চলিতে লোকটা হঠাৎ একটা বাড়ীর সাম্‌নে থামিয়া পড়িল; তার পর একটু এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া সে তার কোর্ত্তার ডান দিকের পকেট হইতে কয়েকটী জিনিষ বাহির করিয়া আনিল। জিনিষগুলির প্রথমটী একটি চূণের কৌটা, সেটী সে তাহার বাঁ হাতে রাখিল; দ্বিতীয়টী এক টুক্‌রা খৈনি-পাতা, সেটীও চূণের কৌটার সঙ্গী হইল! তৃতীয় জিনিষটীর উপর চোখ পড়িতেই কিন্তু লোকটা একটু থতমত খাইয়া গেল, চতুর্দ্দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানিয়া নিমেষের মধ্যে সেটীকে সে ট্যাঁকের ভিতর লুকাইয়া ফেলিল। বোধ করি এ জিনিষটাকে বাহিরে আনা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, অনবধানতা বশতঃ খৈনি-পাতার সহিত জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অপূর্ব্ব সামগ্রী এমন কিছু সেটী নয়, এক টুক্‌রা ভাঁজ করা কাগজমাত্র। কিন্তু বেশ একটু রহস্যময় সে কাগজটী—তাহার ভিতর ইংরাজীতে নিম্নলিখিত কথা কয়টী লেখা ছিল—

বোটানীর প্রোফেসারকে কখন কোথায় পাইব

প্রাতে, ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বাড়ীতে, বেলা ১১টা

হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বালীগঞ্জের ল্যাবোরেটারী ও কলেজে —সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর হইতে আবার বাড়ীতে।

আপাত দৃষ্টিতে কাগজ খানায় মারাত্মক কোন খবরই নাই, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় লিখিত ওরূপ একটা কাগজকে এক নিরক্ষর হিন্দুস্থানীর কোর্ত্তার পকেটে ঘুরিতে দেখিলে ব্যাপারটাকে রহস্যাচ্ছাদিত বলিয়াই মনে হয় এবং সে যদি সন্ত্রস্তভাবে ক্ষিপ্রতার সহিত কাগজখানাকে লোক-চক্ষুর আড়ালে লুকাইয়া ফেলে তবে সে রহস্য ঘনীভূত হয় মাত্র।

এইবার লোকটী বাড়ীর দরজায় মৃদু করাঘাত করিয়া হাঁকিল—"এ দেশ্‌ওয়ালী ভাই, দেশ্‌ওয়ালী ভাই হো!"

খুট্‌ করিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল এবং সেই খোলা দরজার পথে বাহির হইয়া আসিল আর একটী হিন্দুস্থানী। অনুমানে বোধ হইল সে এ বাড়ীর চাকর হইবে, কিন্তু তাহার দেশ্‌ওয়ালী ভাই'কে সে যে চিনিতে পারিয়াছে এমন কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না; জিজ্ঞাসা করিল "কি চাই?"

"বাবু বাড়ী আছে?"

প্রশ্ন এবং পাল্‌টা প্রশ্ন দুই-ই অবশ্য হইল হিন্দিতে।

ও ভাষাটা বুঝিতে পারিলেও লিখিতে আমি তেমন পটু নই, কাজেই উভয়ের কথোপকথন আমি বাংলা ভাষাতেই তর্জ্জমা করিয়া দিব।

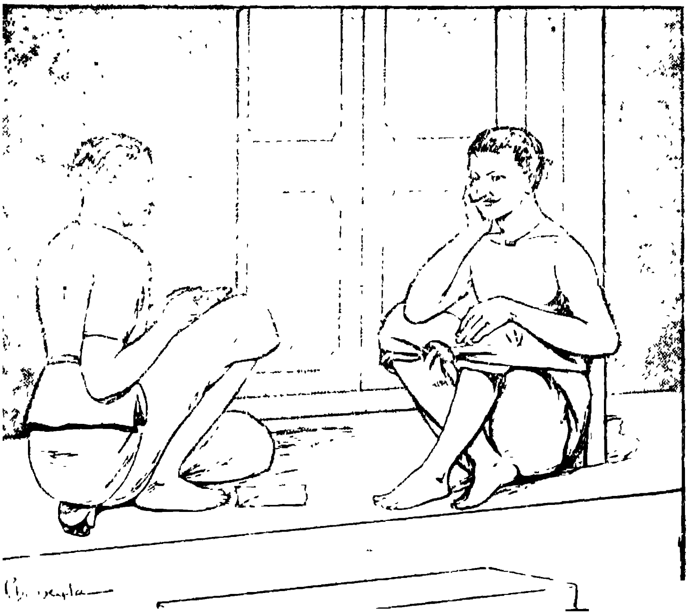
বাড়ীর চাকর উত্তর দিল, "আছে।"

জবাব শুনিয়া আমাদের আগন্তুক হিন্দুস্থানীটি সেই রোয়াকের উপরেই বসিয়া পড়িল! বাড়ীর সম্মুখে জায়গা বেশী না থাকিলেও সেই অল্প জায়গাটুকুই নানা রকম্ ফুলের গাছে ছাইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের ফোটা ফুলের গন্ধে স্থানটীকে করিয়া তুলিয়াছিল বাস্তবিকই মনোরম। বোধ হয় সেই চমৎকার ফুলের গন্ধেই তাহার খৈনি-ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল—খানিকটা খৈনি ডলিয়া সে সামান্য একটু নিজের জন্য রাখিল, বাকীটা হাত বাড়াইয়া দিল বাড়ীর চাকরটিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিল, "আপনার ঘর কোথা, মুঙের জিলা?"

খৈনি লইতে লইতে চাকর উত্তর দিল, "না, দ্বারভাঙ্গা জিলা!"

হাসিতে আগন্তুক হিন্দুস্থানীটির দাঁত একেবারে বাহির হইয়া পড়িল, সে জানাইল তাহারও ঘর দ্বারভাঙ্গা জিলায়। কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সে আরও খানিকটা খৈনি তাহার স্বদেশ-বাসীর উদ্দেশ্যে আগাইয়া ধরিল।

এইবার সৌজন্যে গলিয়া পড়ার পালা এ বাড়ীর চাকরটির ; একে আগন্তুক তার দেশের মানুষ, তার উপর আবার অকাতরে সে খৈনিরূপ মহাদ্রব্য দান করিয়া



আলাপ জমিয়া উঠিল

যাইতেছে, এতটুকু কৃপণতা করিতেছে না। মিনিট্ দশেকের মধ্যেই তাহাদের আলাপ এম্নি গভীর ভাবে

জমিয়া উঠিল যে বোধ করি একের নিকট অপরের ঘরের কোন কথাই আর অপ্রকাশ রহিল না।

সুযোগ বুঝিয়া এতক্ষণে আগন্তুক হিন্দুস্থানী আসল কথা পাড়িল, বলিল, সে আসিয়াছে একবার বাবুর সহিত মোলাকাৎ করিবার জন্য। মাস দুই সে বেকার বসিয়া আছে, আর পারে না। শুনিয়াছে তার 'বাবু'র নাকি কলিকাতায় অনেকের সহিত জানা-শুনা আছে, যদি একটা হিল্লে তিনি করিয়া দিতে পারেন। বলিয়া সে বড়ই করুণ ভাবে তাহার দেশ্‌ওয়ালী ভাইএর দিকে তাকাইল।

বেকার-সমস্যা মিটাইতে দেশের গবর্ণমেন্ট্ পর্য্যন্ত ঘোল খাইয়া যায়, কিন্তু 'দেশ্‌ওয়ালী ভাই'-এর মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল এ যেন তাহারই মুঠার মধ্যে। এমনটী হইবার একটা কারণ ছিল। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাহাদের বাড়ীর বামুনটা চম্পট দিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত নানা যায়গায় ঘুরিয়াও সে অপর একটী বামুন জোগাড় করিতে পারে নাই। কাজেই রাত আট্‌টার সময় ভগবান্ যখন তাহারই দেশের একটী তেওয়ারী বামুন আনিয়া একেবারে দরজার গোড়ায় পৌঁছাইয়া দিলেন এবং সে তেওয়ারী বামুন যখন নিজ হইতেই চাক্‌রীর উমেদারী করিতেছে তখন এক ঢিলে দুই পাখী

মারিবার লোভ যদি দেশওয়ালী ভাই-এর হইয়া থাকে তো সে বড় দোষের কথা নয়। সে বলিল, "এ বাড়ীতে রসুইয়ের কাজ করতে পারবে ?"

অন্ধকারে আগন্তুক হিন্দুস্থানীর চোখ দুটী জ্বলিয়া উঠিল, সারা মুখ দিয়া তার আনন্দের ভাব যেন উপ্‌চাইয়া পড়িল। বাহিরে কিন্তু সে এই গভীর আনন্দের শতাংশের একাংশ ভাগও প্রকাশ পাইতে দিল না, শুধু কহিল, "কেন পারব না, জরুর !"

"আচ্ছা তবে ব'স একটু" বলিয়া তাহার দেশ্‌ওয়ালী ভাই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। একটু পরেই সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চল, বাবু ডাক্‌ছেন, তাঁর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কইবে।"

চাকরের পিছু পিছু তখন নবাগত হিন্দুস্থানী অন্দরের দিকে রওয়ানা হইল এবং তাহারই নির্দ্দেশ মত একটা ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ইলেক্‌ট্রিক-ইস্ত্রির সাহায্যে একটা ওপ্‌ন্‌ব্রেষ্ট্‌ কোট্‌ পালিশ করিতেছিলেন, সাড়া পাইয়া কাজ রাখিয়া তিনি দরজার দিকে আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, "কই হে, তুমিই নাকি রান্নার কাজ করতে চাও ?"

"জী হুজুর।"

"তা, তুমি থাক কোথা? কেউ তোমায় জানে শোনে এখানে?"

"হামি তো হুজুর আভি থাকে বালীগঞ্জ টিশন-পর— একটা চাচা হামার লাগে, কুলিকা কাম করে—তেঁইখানে। এহিখানে একটা ভাতিজা আছে, তেনার বেমারি হয়েছেন, তেঁইজন্যে এসেছে।"

"রান্নাবান্নার কাজ সব জানা আছে তো!"

"সোবি জানে; বালীগঞ্জ বোটানী-বালা লেব্রেটারিমে মহীন বাবু পর্‌ফেসার্‌ যো ছিল উন্‌কো বাড়ীমে তো তিন বরিষ রসুই কিয়েছে!"

"আচ্ছা আজকের রাতটা রাঁধ তো গিয়ে, কেমন কাজ-কর্ম্ম জান দেখে কাল মাইনের কথাবার্ত্তা হবে'খন" বলিয়া ভদ্রলোকটী আবার স্বস্থানে ফিবিয়া গিয়া জামা ইস্ত্রি করিতে লাগিলেন।

মিনিট্‌ কয়েক পরে নবাগত যখন রান্নাঘরের সমস্ত চার্জ্জ্‌ বুঝিয়া পাইল মনের ভিতরটায় তখন তার আনন্দের বান ডাকিয়া যাইতেছিল। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি সেই সময়ে যদি কেউ তার দু'হাতে খান দুই হাজার টাকার নোট্‌ গুঁজিয়া দিত তাহা হইলেও

এর চাইতে এতটুকু বেশী আনন্দ সে পাইত না।

রাত্রি এগারটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত পাট চুকিয়া গেল ; নূতন পাচক মনিবকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইল। রাত বারটাব পর সে বাড়ীর আর একটী প্রাণীও সজাগ রহিল না। শুধু ঘুম নাই বামুন ঠাকুরটীর চোখে। কি মৎলবে, কে বলিবে ?

দেখিতে দেখিতে আরও ঘণ্টাখানেক সময় কাটিয়া গেল ; ঢং করিয়া একটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যার সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে উঠানের উপর একটী ছায়ামূর্ত্তি নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। উঠানের চারি-পাশে পাঁচ-ছ' হাত উঁচু ইটের প্রাচীর, তারপরেই সরু গলি। নিতান্ত অবলীলাক্রমে সে মূর্ত্তি সেই দেওয়ালটী টপ্‌কাইয়া গলির পথে নামিয়া আসিল। এইবার রাস্তার আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়ায় স্পষ্ট বোঝা গেল বামুনঠাকুর রাতারাতি গোপনে সে বাড়ী হইতে সট্‌-কাইয়া পড়িতেছে। আরও বোঝা গেল তাহার মুখের ভাবে যে, যে উদ্দেশ্য লইয়া এ বাড়ীতে আজ সে আসিয়াছিল তাহা পূরামাত্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। গলির পথ ধরিয়া লোকটা ক্রমে বড় রাস্তায় আসিয়া পৌছিল। মিনিট্ পনেরো পথ চলিয়া শেষে রাস্তার ধারে যে ঘরটীর কাছে

আসিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল মাথার উপরকার সাইন-বোর্ড্ দেখিলেই জানা যায় সেটী একটা নাপিতের দোকান—তবে হাল্-ফ্যাসানের।

দ্বারে বার দুই মৃদু করাঘাত করিতেই একটী লোক তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া খাটো গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর ?"

"ভয়ানক রকম ভাল ; তাড়াতাড়ি এখন একটু চায়ের জোগাড় দেখ তো ?"

সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া রণজিতের আক্ষেপের আর অবধি রহিল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল একটা সুবর্ণসুযোগ আজ সে শুধু নিজের বুদ্ধির দোষে হারাইয়াছে। এ রহস্যময় হিন্দুস্থানী ভূপেশ বাবুর ঘড়ি-চুরির সহিত যে সংশ্লিষ্ট তাহাতে আর সন্দেহের বাষ্পটুকুও ছিল না ; গোপনে রণজিৎকে অনুসরণ করার আর কী অর্থ হইতে পারে ? হুকা-কাশির মুখে শোনা ছিল যে সেদিন ডাষ্ট্‌বিন্ হইতে পাঁচশ' আঠারো নম্বরের ঘড়িটী উদ্ধারের পর ঘড়িচোর তাহাকে এবং হুকা-কাশিকে একত্র দেখিতে পাইয়াছে—অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হুকা-কাশির সহিত সেও যে বদ্ধপরিকর তাহা

টের পাইয়াছে। তাহাকে নানারূপ বিপদে ফেলিতে নিশ্চয়ই সে কোন চেষ্টারই কসুর করিবে না। গভীর কোন মৎলব মনে মনে আঁটিয়া সে তাহার অনুসরণ করিতেছিল, অথচ মূর্খ সে, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও নিতান্ত আনাড়ির মত সমস্ত মাটী করিয়া ফেলিল। একবার যদি হুকা-কাশির খপ্পরে নিয়া ইহাকে ফেলা যাইত!

যাক্, যা ঘটিয়া গেছে তা তো আর ফিরাইবার নয়, তবে কাল সকালে যাইয়াই হুকা-কাশিকে সমস্ত কথা আগাগোড়া বলিতে হইবে।

পরদিন সকালে রণজিৎ যখন হুকা-কাশির বাড়ীর দিকে রওনা হইল বেলা তখন বোধ করি আট্টা। বাড়ীর নিকটে আসিতে রাস্তা হইতেই নজরে পড়িল সাম্নের বসিবার ঘরটীতে তিনি আরও কা'র কা'র সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। হুকা-কাশির বাড়ীতে রণজিতের লোকাচারের কোনই বালাই নাই, সে তাই সটান গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল; দেখিল, লোক নূতন কেহই নয়—বিমল ও বিরূপাক্ষ আচার্য্য। বিমলকে আজ যেন একটু অতিরিক্ত রকমের খোসমেজাজী দেখাইতেছিল। রণজিৎ ঘরে ঢুকিবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সে কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমি তবে এখন একটু উঠি,

ঘণ্টাখানেক বাদে ফির্ব। বিরূপাক্ষ বাবু, আপনি বরং ততক্ষণ এখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করুন।" তারপর রণজিতের দিকে ফিরিয়া কহিল, "একটী কথা শুনে খুব খুসী হবেন, রণজিৎ বাবু, বাবার অবস্থাটা কাল রাত্তির থেকে হঠাৎ ভালোর দিকে টার্ণ্ নিয়েছে। ডাক্তারেরা দেখে খুব আশা পেয়েছেন, বল্ছেন এ রকম চল্লে মাস-খানেকের ভেতরই তাঁকে সম্পূর্ণ আরোগ্য ক'রে তুল্তে পার্বেন। আচ্ছা চলি, নমস্কার!"

খবরটীতে বাস্তবিকই আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া রণজিৎ বিমলকে প্রতি-নমস্কার করিল, তারপর তাহারই পরিত্যক্ত চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল। হুকা-কাশি বলিলেন, "সাম্নের রাস্তা দিয়ে এঁরা দু' জন যাচ্ছিলেন, আমায় ঘরে বসে থাক্তে দেখে খবরটা দিতে ভেতরে এসে ঢুকেছেন। ডাক্তারদের নাকি এখন অনুমান হচ্ছে প্রোফেসার গুপ্তের এই হঠাৎ-পাগল-হওয়ার ভেতর একটা কিছু রহস্য থাকা খুবই সম্ভব। বিরূপাক্ষ বাবুর য়্যাক্সিডেণ্ট্টায় ওঁকে খুবই কাবু করে ফেলেছে সন্দেহ নেই, তবে তাতেও পিছ্-পা ইনি নন, রহস্য-আবিষ্কারে আমায় সাহায্য কর্বেন বল্ছেন। তারপর রণজিৎ বাবু, ভূপেশ বাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যে আর

দেখা-টেখা হল? না না, ইতস্ততঃ কর্‌বার কোন হেতু নেই, কথাগুলো পাঁচ-সাত কাণ করা ঠিক নয় বটে, তবে এঁর সাম্‌নে অনায়াসেই সব কথা আপনি আমায় বল্‌তে পারেন!"

রণজিৎ লজ্জা পাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "না তা নয়,...তবে কিনা আমার একটা মস্ত বড় ক্রটীর কথা এক্ষুণি আপনার কাছে স্বীকার কর্‌তে হবে, তাই আগে হতেই মাপ্‌ চেয়ে রাখ্‌ছি।...হয় ঘড়ি-চোর স্বয়ং, আর নয় তো তারই কোন অন্তরঙ্গ সাকরেদ্‌ একেবারে আমার মুঠোর ভেতর এসে পড়েছিল, শুধু নিজের বুদ্ধির দোষে তাকে আমি আট্‌কে ফেল্‌তে পারি নি। কাল ঠিক সন্ধ্যের সময় ব্যাপারটী ঘটেছে।"

গভীর আগ্রহে সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুকা-কাশি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, বলেন কি? আমিও যে কাল ঠিক সন্ধ্যের পরেই সেই ঘড়ি-চোরকে আবিষ্কার করে ফেলেছি! আপনার সে লোকটার কি রকম চেহারা বলুন তো, দেখি আমার লোকটার সঙ্গে সে বর্ণনা মেলে কিনা!"

রণজিতের বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিতে লাগিল, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, লোকটা কি হিন্দুস্থানী?"

দাঁত এবং জিভের সাহায্যে একটা শব্দ করিয়া হুকা-কাশি বলিলেন, "এঃ যাঃ, মিল্‌ল না তো! আমি যার কথা বল্‌ছি সে যে বাঙ্গালী। তবে আমার চোখে ধূলো দিয়ে পালাতে সে পাবে নি। দেখ্‌বেন তাকে?"

রণজিতের বুকটা আবার ধুক্ ধুক্ করিয়া উঠিল, সে বলিল, "পারেন নাকি দেখাতে?"

"নিশ্চয়! এই দেখুন সেই ঘড়ি-চোর।" বলিয়া আঙ্গুল দিয়া হুকা-কাশি বিরূপাক্ষ আচার্য্যকে দেখাইয়া দিলেন।

বিদ্যুতের স্পর্শ পাইলেও ঘরের বাকী দুইজন প্রাণী অধিকতর চম্‌কাইত না। রণজিৎ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল—বিরূপাক্ষ সর্পদষ্টের মত সভয়ে হুকা-কাশির দিকে একবার মাত্র তাকাইয়াই নিরুপায়ের মত চেয়ারের গায়ে নিজেকে এলাইয়া দিল।

—নয়-

কঠিন ভাবে বিরূপাক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া হুকা-কাশি কহিলেন, "কী রেখেছিলেন ঘড়ির ভেতরে বলুন!"

মাটীর দিকে দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বিরূপাক্ষ

কোন মতে উত্তর দিল, "একটু খানি রেয়ার্ আর্থ্-মেটাল।"

জলন্ত অঙ্গারের মত হুকা-কাশির চোখ দুটী জ্বলিয়া উঠিল, স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "অকৃতজ্ঞ, নরাধম, তোমার উপযুক্ত শাস্তি ঐ।" দেয়ালের গায়ে একখানা চাবুক ঝুলিতেছিল, আঙ্গুল দিয়া হুকা-কাশি সেইটী দেখাইয়া দিলেন।

রণজিৎ বিমূঢ়ের মত শুধু একবার ইহার, আর একবার উহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল, কিছুই তার বোধগম্য হইতেছিল না। তাহার বিবেচনায় রহস্যটা যেন সরল হওয়া দূরে থাক্, আরও গভীর হইয়া উঠিতেছে।

ততক্ষণে কিন্তু হুকা-কাশি তাঁহার সাময়িক উত্তেজনা সম্পূর্ণ দমন করিয়া ফেলিয়াছেন ; একটু মৃদু হাসিয়া রণজিতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "উঁহু অমন হতভম্বের মত আর তাকাবেন না রণজিৎ বাবু, রহস্য ষোল আনাই ভেদ হয়ে গেছে, কোথাও এতটুকু ঠেকে নাই। মানুষ খোদ্ শয়তানের চেলা হয়েও ভাল মানুষের মুখোস প'রে কেমন হেসে খেলে বেড়াতে পারে তারই গল্প আজ আপনাকে শোনাব। প্রোফেসার গুপ্ত, যাঁর দয়ায় এ হতভাগা আজ লোক-সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে,

দেখবেন নিজের ঘৃণ্য স্বার্থের কাছে তাঁকে বলি দিতে এর এতটুকু বাধে নি—এমনই নিমক-হারাম এ। যে ভাবে আস্তে আস্তে এগোবার ফলে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, ঠিক সেই ভাবেই আমি আমার গল্প বলে যাই, আপনি শুনুন, কেমন?—.

"সেদিন ভূপেশ বাবু এসে তাঁর ঘড়ি-চুরির যে বর্ণনা দিয়ে গেলেন তা বাস্তবিকই খুব বিস্ময়কর। সাধারণ শ্রেণীর কোন চোরের কাজ এ নয়, কেননা দেরাজের ভেতর তা হলে গয়নাগুলো কখনই পাওয়া যেত না। যদি বলেন, এ পাগলের কাণ্ড, তাও বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই, কেননা অতখানি হুঁসিয়ারির সঙ্গে কাজ হাসিল করা কোন পাগলের অসাধ্য। ঘড়িটার ওপর কারো আক্রোশ আছে এমনও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। ভূপেশ বাবু অবশ্য তাঁর নলকোপার শ্রীশ চাটুয্যের কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয়। ভেবে দেখুন যে লোকটাকে আপনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন সকলে মিলে তারই ছবি নিয়ে পূজো করছে—এ দৃশ্য দেখলে হঠাৎ হয়তো নিজেকে সামলাতে না পেরে ছুটে গিয়ে সেই ছবিখানার অপমান করা তেমন বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই বলে সে রাগটাকে আজন্ম কাল পুষে রেখে তার মরার

পঁয়ত্রিশ বছর পরে কোথায় কোন্ ঘড়ি না কি স্মৃতিচিহ্ন আছে সেইটেকে চুপি চুপি সরিয়ে নষ্ট করে ফেলা—এ শুধু গল্প-উপন্যাসেই পড়া যায়, বাস্তব জগতে কখনো চোখে পড়ে না। আমার এ ধারণা যে অভ্রান্ত তার পরিচয়ও পরে পেয়েছেন আপনারা।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া হুকা-কাশি একটু থামিলেন, তারপর নস্যদানটা হইতে এক টিপ নস্য লইয়া পুনরায় বলিতে সুরু করিলেন,"ব্যাপারটা ক্রমে কেমন ঘোরাল হয়ে উঠ্‌ছে দেখ্‌ছেন! যতগুলো সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে খুঁটে দেখার ফলে সবগুলিই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কোন অর্থই যেন এ চুরির থাক্‌তে পারে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে, বেশ ক'রে তলিয়ে দেখ্‌লে পর আর একটা সম্ভাবনা ধীরে ধীরে মনের ভেতর উঁকি মারতে আরম্ভ করে—এমনও তো হতে পারে যে ঘড়িটা নেওয়া চোরের একেবারেই উদ্দেশ্য ছিল না, ঘড়ির ডালার নীচে আর 'একটা কিছু' লুকোনো ছিল, আর সেটাই ছিল চোরের আসল লক্ষ্য! সেটী উদ্ধারের পর ঘড়িতে আর তার কোনই প্রয়োজন ছিল না, তাই সে দূরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

"অন্যান্য সবগুলো সম্ভাবনাই যখন একে একে

যুক্তিতর্কে অচল হয়ে পড়ল এ সন্দেহটাই তখন একমাত্র সম্ভাবনা ব'লে স্বভাবতঃই মনে জেগে উঠ্‌ল। এত কষ্টে এবং এত সন্তর্পণে যে ঘড়ি হাতে এসেছে সেটাকে সঙ্গে না নিয়ে ফেলে রেখে যাওয়ায় সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল বই কম্‌ল না। কি হবে আর ও ঘড়িতে, আসল জিনিষ সে যে পেয়ে গেছে!

"কিন্তু অনেক কিছু ভাব্‌বার আছে এর ভেতর। ঘড়িটা আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ভূপেশ বাবুর নিজের কাছে সিন্দুকে রয়েছে, চাবি বরাবর তাঁর কাছে। তাঁর সম্পূর্ণ অজানাতে অপর কোন লোক এ ঘড়ির ডালার নীচে কোন কিছু লুকিয়ে রাখ্‌বার সুযোগ-সুবিধে পেলে কি ভাবে? 'তাঁর অজানাতে' বল্‌ছি এই জন্যে যে এ রকম একটা কিছু ঘটার কথা জান্‌লে অবশ্যই তা তিনি তখন আমায় বল্‌তেন। কাজেই বুঝ্‌লাম, আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তবে দিন কয়েকের জন্য ঘড়িটা নিশ্চয়ই ভূপেশ বাবুর হাত থেকে অন্য কারো হাতে গিয়েছিল। কিন্তু কার হাতে যেতে পারে? এমন একটা পুরোনো বাতিল ঘড়িতে দরকার পড়্‌তে পারে কার? কারুর বলেই তো মনে হয় না। সুতরাং ঘড়ি যদি বাস্তবিকই এর ভেতর ভূপেশ বাবুর হাতছাড়া হয়ে থাকে তবে

নিশ্চয়ই সেটা তিনি কোন ঘড়িওয়ালার দোকানে মেরামত কর্‌তে দিয়েছিলেন এবং সেই সময়েতেই কেউ এর ডালার নীচে কোন জিনিষ লুকিয়েছে। ভূপেশ বাবুকে তাই প্রশ্ন কর্‌লাম, 'আচ্ছা, চুরি যাবার ক'দিন আগে এবং কোন্ দোকানে ঘড়িটাকে মেরামৎ কর্‌তে পাঠিয়েছিলেন, বলুন তো!' ভূপেশ বাবু চম্‌কে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, 'মেরামৎ কর্‌তে দিয়েছিলাম সে কথা জানলেন কি ক'রে? এখন পর্য্যন্ত সে কথা তো আপনাকে বলাই হয় নি!' আমার প্রশ্নে আপনি নিজেও কম আশ্চর্য্য হন নি কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছেন এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না—গোড়া থেকে ব্যাপারটা সঠিক এঁচে আস্‌তে পার্‌লে ঠিক এই প্রশ্নটা আপনাদেরও মনে উঠত, না উঠ্‌লেই ববং আশ্চর্য্য হ'তেন।

"আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপনাদের কাণে আরও অদ্ভুত শোনাল,—আমি জান্‌তে চাইলাম ভূপেশ বাবুর বাগানটা কি একটানা ফুলেরই বাগান নাকি সেটাতে ফোয়ারা-টোয়ারা অথবা কৃত্রিম পাহাড়-টাহাড় কিছু আছে। ঘড়ি চুরির সঙ্গে এ কথার কি সম্পর্ক থাক্‌তে পারে না বুঝে আপনারা চোখ দুটোকে যেমন বহরমপুরী ছানাবড়া করে তুলেছিলেন তা মনে ক'রে এখনও আমার

হাসি পাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা কি বাস্তবিকই অবান্তর? আপনার স্মরণ আছে, ভূপেশ বাবুর ছেলে ঘড়িটাকে ভাঙ্গা অবস্থায় তাদের বাগানের ভেতর কুড়িয়ে পেয়েছিল। এখন, ঘড়ি-চুরির যে কারণটা আমি মনে মনে ঠাউরেছি সেটা যদি বাস্তবিকই ঠিক হয় তবে স্বভাবতঃই মনে ছু' ছু'টো প্রশ্ন ওঠে—ঘড়িটা বাগানের ভেতরেই বা গেল কেন, আর ওটাকে ভাঙ্গা অবস্থাতেই বা দেখ্ছি কেন? ঘড়ির ডালার নীচে যদি কোন জিনিষ লুকোনো থাকে, তবে চোর তো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক নিমেষেই তা বার করে ফেল্‌তে পারে, বাগানের ভেতর তো ঢোক্‌বার তার কিছুমাত্র দরকার নেই! দ্বিতীয়তঃ ঘড়ির ওপর চোরের তো রাগের কোনই কারণ নেই, সে কেন মিছে-মিছি অত কষ্ট করে বাগানে ঢুকে ওটাকে ভাঙ্গ্‌তে যাবে? এ ছু'টো প্রশ্নেরই শুধু একটী জবাব সম্ভব—ঘর থেকে চোর ঘড়িটী বার করে বাইরের বারান্দায় নিয়ে এসেছিল; তার পর ডালা খুলে লুকোনো জিনিষটিকে উদ্ধার করে অপ্রয়োজনীয় বোধে ঘড়িটাকে বাগানের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু বাগানের নরম নরম ঘাসের ওপর পড়্‌লে ঘড়িটা তো ওভাবে ভেঙ্গে যাওয়া উচিত নয়; নিশ্চয়ই তা হলে কোন একটা শক্ত জিনিষের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে।

ভূপেশ বাবু ধনী এবং সৌখীন, তাঁর বাগানের ভেতর



বাগানের ভেতর ছুঁড়ে···

ইটের পাঁজা বা অন্য কোন বাজে শক্ত জিনিষ থাকার কথা

নয়। বড়লোকের বাগানে শক্ত জিনিষের ভেতর শত করা সত্তর ভাগই থাকে জলের ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড়—এই সব। যেটা বেশীর ভাগ দেখা যায় সেটাই আমাদের প্রথমে মনে করে নেওয়া কর্ত্তব্য ; সেটা যদি না মেলে তা হলে অবশ্য অন্য জিনিষ নিয়ে বিচার কর্‌তে হবে। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আচ্ছা ভূপেশ বাবু, আপনার বাগানে কি জলেব ফোয়ারা বা কৃত্রিম পাহাড়—এ সব কিছু আছে ?'

"তিনি জানালেন 'ফোয়ারা আছে ;'

"একটা, না সারি সাবি অনেকগুলো ?"

"এ কথা জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্য্য এই যে বাগানে যদি শুধু একটাই ফোয়ারা থাকে তবে অন্য জায়গায় ঘড়িটা এসে না পড়ে ঠিক তারই গায়ে এসে পড়াটা যেন অনেকটা দৈবের ব্যাপার হয়ে পড়ে ! কিন্তু সারি সারি অনেক-গুলো ফোয়ারা থাক্‌লে একটা-না-একটার গায়ে ঘড়িটা এসে পড়া খুবই সম্ভব।

"ভূপেশ বাবু জবাব দিলেন, 'না, নিতান্ত দু-একটীও নয়।' আপনি পরে হয়তো শুনে থাক্‌বেন, একটা ফোয়ারার কাছেই ঘড়িটাকে পাওয়া গেছ্‌ল।

"এর পর ভূপেশ বাবুর বাড়ীটা আমি একবার দেখে

এলাম। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, সিঁড়ি, বারান্দা এবং বাগান কি ভাবে অবস্থিত তাই জানা। দেখা গেল অন্দর থেকে ছুটে রাস্তায় বার হয়ে এসে চোর প্রথমেই বারান্দা পেয়েছে; বারান্দার পাশেই সিঁড়ি এবং দুধারে বাগান। বুঝ্‌লাম বারান্দা থেকেই বাগান-বরাবর সে ঘড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল; তার পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ীর বার হয়ে গিয়েছিল।

"এই বার প্রশ্ন উঠ্‌ল, ঘড়ির ভেতরে সেই মূল্যবান্ জিনিষটী কে পূর্‌লে। ঘড়িওয়ালা যে নয় তা সুনিশ্চিত, কেননা তা হলে ভূপেশবাবুকে ঘড়ি ফিরিয়ে দেবার আগে নিশ্চয়ই সে সেটা বার করে রাখ্‌ত, বিপদ্ মাথায় করে রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ী গিয়ে হানা দিত না। তবে সঙ্গে-সঙ্গে এটাও বুঝ্‌লাম যে, যে মহাপ্রভু এ কাণ্ডটা করেছে ঘড়িওয়ালার সে পরিচিত লোক—অপরিচিত লোক হলে দোকানদারের অসাক্ষাতে তার দোকানের ঘড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌বার সুযোগ সে পেত না। ভাব্‌লাম, দেখা যাক্ ঘড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে একটু কথা-বার্ত্তা কয়ে যদি কিছু আলোর রেখা পাওয়া যায়!

"তার পর ঘড়িওয়ালার দোকানে ঢোক্‌বার পর,

তার মুখ থেকে আরও একটা ষ্টোভার মার্কা ঘড়ি চুরি যাওয়ার কথা, অর্ডার বুকের পাতা ছেঁড়ার কথা, কি ভাবে ভূপেশ বাবুর ঘড়িচোর আর দোকানের নতুন ঘড়িচোর একই লোক টের পেয়ে যাই তার কথা, এবং সর্ব্বশেষে ডাষ্টবিনে ছ নম্বরের ষ্টোভার ঘড়িটার সন্ধান পাওয়ার কথা—সমস্তই আপনি জানেন, তা নিয়ে আর বৃথা সময়ক্ষেপ করার আবশ্যক নেই। ঘড়িটা আমি হাতে করে না ধরে একটা কাঠির সাহায্যে তুলে ফেল্লাম। এ রকম কর্‌বার হেতু এই যে, যদি চোরের হাতের ছাপের কোন একটা হদিশ পাই। কিন্তু এরই থেকে যে এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য আমার চোখের সামনে খুলে যাবে সে কি তখন স্বপ্নেও ভেবেছি ?

"অপরাধীকে খোঁজার সুবিধার জন্য যাঁরা হাতের ছাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকেন তাঁরা সাদা মত এক রকম গুঁড়ো ব্যবহার করেন যেটা অস্পষ্ট ছাপের ওপর পড়ে তাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। সময় বিশেষে কাজে লাগ্‌তে পারে ভেবে সেই রকমের খানিকটা গুঁড়ো আমিও নিজের কাছে রেখে থাকি। ঘড়ির ওপর সেই গুঁড়ো ছড়াতেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার আমার চোখে পড়্‌ল। ঘড়ির গায়ে যেখানে যেখানে হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ

পড়েছে ঠিক তারই পাশে পাশে ছোট এবং অস্পষ্ট রকমের একটা দাগ বরাবর দেখা দিল। খুব ছোট এবং অস্পষ্ট হলেও সেটাকে আঙ্গুলের দাগ বলেই মনে হয়, অথচ মজা এই, বুড়ো আঙ্গুল ও অবস্থাতে থাক্‌লে অন্য কোন আঙ্গুল ওখানে ওভাবে আস্‌তেই পারে না। ব্যাপারটা আপনাকে দেখালাম, আপনি কিছুই ঠাওর কর্‌তে পার্‌লেন না। আসল ব্যাপারটা কিন্তু তখনই আমি এঁচে ফেলেছি। বলুন তো কিসের দাগ সেটা ?" বলিয়া হুকা-কাশি স্মিতমুখে রণজিতের দিকে তাকাইলেন।

রণজিৎ একটু কাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কিসেব ?"

"ষষ্ঠ আঙ্গুলের, অর্থাৎ ঘড়িচোরের হাতের আঙ্গুল পাঁচটা নয়, ছ'টা। বুড়ো আঙ্গুলের পাশে আরও একটী ছোট্ট আঙ্গুল আছে, তারই দাগ বরাবর বুড়ো আঙ্গুলটার পাশে পাশে ছাপে ধরা পড়েছে। কিন্তু তবুও একেবারে নিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত কারো কাছে কিছু প্রকাশ করা অথবা শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগোন ভাল বোধ কর্‌লাম না—ঠিক কর্‌লাম আমার অনুমানটাকে আরও একটু যাচাই করে নিতে হবে।"

-দশ—

"ধীরে সুস্থে ঘড়িটা তুলে রাখ্‌লাম, স্বপ্নেও কিন্তু তখন ভাব্‌তে পারি নি যে সেটার জন্যে সেই রাত্রিতেই আমার বাড়ীর ওপর আক্রমণ হবে। এখন অবশ্য বুঝ্‌তে পার্‌ছি এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না, কেননা ঘড়ি-চোরের, অর্থাৎ এই বিরূপাক্ষ আচার্য্যের সদা-সর্ব্বদাই সেইখানটাতে—প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ীতে—যাতায়াত ছিল, ডাষ্ট্‌বিন্‌ থেকে আমাকে একটা ঘড়ি তুলে নিতে দেখা তার কিছুই বিচিত্র নয়, বরং স্বাভাবিকই। আমার মত একটা সর্ব্বনেশে লোককে ডাষ্ট্‌বিন্‌ থেকে কাঠির সাহায্যে ঘড়িটা তুলে নিতে দেখে নিশ্চয়ই সে যার পর নাই ভড়্‌কে গিয়েছিল, ভেবেছিল এ ভাবে আল্‌গোছে ঘড়িটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার নিশ্চয়ই কোন বড় রকমের একটা গূঢ় কারণ আছে। তাই সে চুপি চুপি সেখান থেকেই আমাদের পেছু নিয়েছিল, সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে আমরা তার কিছুই টের পাই নি।

"আমরা ঘরে এসে ঢোক্‌বার পর পরস্পরের সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা বলেছি আড়ি পেতে বারান্দায় লুকিয়ে লুকিয়ে চোর নিশ্চয়ই সে সমস্ত শুনেছে; বুড়ো আঙ্গুলের পাশে পাশে বরাবর সমানে যে দাগটা দেখা যাচ্ছে তার

যখন উল্লেখ আমি কর্‌লাম তখন বেচারা নিশ্চয়ই ভয়ে নীল হয়ে গেছ্‌ল, কেননা সেটা যে বাস্তবিকই একটা বাড়্‌তি আঙ্গুলের দাগ সে খবর সঠিক জানা গেলে বেশ একটু তার বিপদের সম্ভাবনা। কাজেই সে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মনে মনে দু' দু'টো মৎলব এঁটে ফেল্লে—প্রথম, রাতারাতি যে করেই হোক্ দু নম্বরের ষ্টোভার ঘড়িটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তার অপরাধের সমস্ত চিহ্ন ঢেকে ফেলবে ; আর দ্বিতীয়তঃ, তার ডান হাতে যে ছ'টা আঙ্গুল সে খবরটাও আপাততঃ কিছুদিনের জন্যে আমার চোখ থেকে লুকিয়ে রাখ্‌বে। সবে এক দিন মিনিট কয়েকের জন্যে তো তার সঙ্গে আমার আলাপ, কাজেই বুড়ো আঙ্গুলের পাশে অত ছোট্ট আঙ্গুলটী আমার লক্ষ্যে না পড়ারই কথা—আর বাস্তবিক সত্যি বল্‌তে কি তখন তা পড়েও নি। তাই সে কনুই থেকে আরম্ভ করে সমস্ত হাতটা ন্যাক্‌ড়ার ব্যাণ্ডেজে ঢেকে ফেল্লে, একটা কাঠের ফ্রেম্ তার চার দিকে আঁট্‌লে, আর ব'লে বেড়াতে লাগ্‌ল চল্‌তি বাস্ থেকে পড়ে তার হাত একেবারে ছাতু হয়ে গেছে। আসলে এ সব মিথ্যে কথা, শুধু আমার চোখ থেকে বাড়্‌তি আঙ্গুলটা ঢাকবার জন্যে সে এ চাতুরী খেলেছে। অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই আমি তা

বুঝ্‌তে পারি নি, বুঝেছি পরে, এবং কি করে তাও ক্রমশঃ বল্‌ছি। আমার এ কথাগুলি যে একেবারেই অভ্রান্ত তার প্রমাণ দেখ্‌বেন?" বলিতে বলিতে হুকা-কাশি বিরূপাক্ষের হাতের ব্যাণ্ডেজটা খুলিয়া ফেলিলেন—বিরূপাক্ষ বাধা দিল না, নির্জ্জীবের মত চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া রহিল। একটু পরেই রণজিৎ দেখিল, বিরূপাক্ষের হাত দিব্যি অক্ষতভাবেই রহিয়াছে, তাহাতে কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগও নাই, এবং বুড়ো আঙ্গুলের পাশে বাস্তবিকই আরও একটী ক্ষুদে আঙ্গুল বিরাজ করিতেছে। নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শুধু সে একবার হুকা-কাশির দিকে তাকাইল।

একটু হাসিয়া হুকা-কাশি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম—বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এই চোর ফন্দি দুটো এঁটে ফেল্লে। কল্‌কাতা সহরে টাকা ছড়াতে পার্‌লে ভাড়াটে গুণ্ডার অভাব হয় না, তারই কয়েকটী সংগ্রহ করে দুপুর রাতে আমার বাড়ীতে এসে ও মহা উৎপাৎ বাধাল; কিন্তু ঘড়িটী সংগ্রহ করতে পারলে না। এদিকে বেশী সময় ও থাক্‌তেও পারে না, কেননা যদি কোন গতিকে আমি ওকে একবার চিনে ফেলি তা হলেই সর্ব্বনাশ; আর তা

ছাড়া ভোরে গিয়েই যে আবার ওকে প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ী হাজরে দিতে হবে! আমায় নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখাও ওর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না, কেননা ভাড়াটে গুণ্ডা দ্বারা সেকাজটী অত সহজে হয় না।

"কিছু বেলা হলে পর আপনি এসে আমাদের মুক্তি দিয়ে ভূপেশ বাবুর চিঠিখানা দেখালেন। চিঠি পড়েই কিন্তু বেশ বুঝ্‌লাম ভূপেশ বাবু ভুল করেছেন—আসল চোরের উদ্দেশ তিনি পান নি, অন্য কাউকে সন্দেহক্রমে আটক করেছেন। সাদা কথায় সমস্ত ব্যাপারটা কি?—একটা দোকানে ভূপেশ বাবু তাঁর একটা পুরোনো ঘড়ি সারাতে দিয়েছিলেন; ইতি মধ্যে কোন লোক সেই ঘড়ির ডালার নীচে অতি সঙ্গোপনে খুব দামী অথচ গোপনীয় একটী জিনিষ লুকিয়ে রাখ্‌ল। পরে সেটাকে বার করে নেবার আগেই কিন্তু ঘড়ি দোকান থেকে মালিকের কাছে চলে গেল। তাই সে সন্ধান নিয়ে নিয়ে গভীর রাতে মালিকের বাড়ী উপস্থিত হয়ে ঘড়ির ভেতর থেকে সেই লুকোনো জিনিষটা বার করে বাগানের ভেতর ঘড়িটা ফেলে দিয়ে গেছে—এই তো? এ যদি হয়, তবে ঘড়ি-চোর এর পরে কি জন্যে আর ভূপেশ বাবুর বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়াতে যাবে? সেখানে আর তার কোন্

কাজ ? কাজেই বুঝলাম, ভূপেশ বাবু সন্দেহক্রমে অপর কাউকে পাক্‌ড়ে আমাদের খবর দিয়েছেন। কিন্তু তবু তাঁর কাছে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনায় দু'জনে সেখানে গেলাম। আমার অনুমান যে সত্যি তা নলকোপার শ্রীশ চাটুয্যেকে সেখানে দেখেই টের পাওয়া গেল।

"ভূপেশ বাবুর ওখান থেকে বার হবার পর আপনাকে বাড়ী ফির্‌তে বলে আমি সোজা ভবানীপুরের বাস্ ধর্‌লাম—বোটানীর অধ্যাপক মশায়ের বাড়ী যাব বলে। এ অধ্যাপক মশায়টী আপনাকে দেখ্‌ছি বড়ই ভাবিয়ে তুলেছেন ; আপনি ভেবে পাচ্ছেন না এ বিষয়টাতে কি ভাবে তিনি আমায় সাহায্য কর্‌তে পারেন। আসল ব্যাপারটা এই যে এ ভদ্রলোকটী দিবারাত্র নানা রকমের যন্ত্র-পাতি নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন। এমন চমৎকার চমৎকার যন্ত্র তাঁর কাছে রয়েছে যাতে ক'রে পিঁপ্‌ড়েটিকেও ব্যাঙের মত বড় করে তোলা চলে। কাজেই ভাব্‌লাম, ডাষ্টবিনে কুড়িয়ে পাওয়া ঘড়িটার ওপর যে অস্পষ্ট দাগ উঠেছে সেটা বাস্তবিকই চোরের ডান হাতের বাড়তি আঙ্গুলের দাগ কিনা তা যাচাই কর্‌বার পক্ষে আমার পরিচিত মহলে এমন লোক আর পাব না।

"রওনা হ'তেই দেরী হয়ে গিয়েছিল, তাই ভদ্রলোককে

গিয়ে আর বাড়ী পাওয়া গেল না; তবু তাঁর ভাইকে জিজ্ঞাসা করে কখন তিনি কোথায় থাকেন একটা কাগজের টুক্‌রায় তা বেশ করে টুকে নিলাম—প্রাতে ৬টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত বাড়ীতে, ১১টা থেকে চারটে পর্য্যন্ত বালীগঞ্জের ল্যাবোরেটারীতে বা কলেজে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর আবার বাড়ীতে—ইত্যাদি। এগারটার কিছু পরেই বালীগঞ্জে গিয়ে তাঁকে পাকড়াও করা গেল—তখন ল্যাবোরেটারীতে আর কোন তৃতীয় প্রাণী নেই। আধ ঘণ্টা বাদে যখন সেখান থেকে বেরোলাম তখন অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমার ধারণাই অভ্রান্ত, অর্থাৎ সে দাগগুলি বাস্তবিকই কোন লোকের বাড়তি ক্ষুদে আঙ্গুলের দাগ।

"ব্যাপারটা তা' হলে দাঁড়াল এই—ভূপেশ বাবুর ঘড়িটী যখন দোকানে মেরামৎ হতে এসেছে তখন এক ছ'আঙ্গুলে লোক খুব গোপনে ছোট্ট একটী দামী জিনিষ ঘড়ির ডালার নীচে পূরে সেটাকে বন্ধ করে রেখেছিল। 'কেন' সে কথা পরে হবে। আচ্ছা, একটা কথা আপনার মনে জাগ্‌ছে কি? ঘড়ির দোকানে ঢুকে কোন ঘড়ির ডালার নীচে অপরের অলক্ষ্যে কোন জিনিষ লুকিয়ে রাখ্‌বার সুযোগ লোকে কখন পায়? নিতান্ত অপরিচিত

হলে এমন সুযোগ পায় কি? অপরিচিত লোককে তার খুসী মত মেরামতের ঘড়ি নাড়াচাড়া করতে দেবে কেন?



[illegible]

কাজেই সে ছ'আঙ্গুলে লোকটা নিশ্চয়ই ঘড়িওয়ালার পরিচিত—কেমন সক্রিতর্কে তাই মনে হয় না?”

রণজিৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হয়।"

"তা হলে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে ঘড়িচোর ঘড়িওয়ালার পরিচিত এবং তার ডান হাতে ছ'টা আঙ্গুল আছে। আচ্ছা রণজিৎ বাবু, আপনার জানাশোনা ছ'আঙ্গুলে মানুষ ক'জন আছে?"

রণজিৎ একটু ভাবিয়া কহিল, "কই, একজনাকেও তো মনে করতে পারছি না!"

হুকা-কাশি কহিলেন, "হুঁ; শুধু আপনি বলে নন, ঘড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলে দেখবেন সেও এই জবাবই দেবে যে তার জানাশোনার ভেতরেও এ হেন লোক নিতান্ত দু'-একজন ছাড়া নেই। কি করে থাকবে বলুন, ডান হাতে ছ'টা আঙ্গুল নিয়ে মানুষ তো আর কিছু ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না, অল্প সংখ্যক লোকই সে রকমের হয়ে থাকে।

"বাড়ী ফিরে এসে খাওয়াদাওয়ার পাট সেরে দিব্যি চোস্ত একটী হিন্দুস্থানীর ছদ্মবেশ পরে ফেলা গেল—ময়লা কাপড়ের ওপর আনকোরা মেরজাই, রেড়ির তেলে ভেজানো রাম-নাগরা, গলায় হাতে ঘুনসি-তাগা—কিছুই বাদ পড়ল না। আরশিতে চেহারা দেখে গেছি আর

কি! কে বলে 'মুঙের জিলার ভড়াস্ ডার্হীতে' আমার মুলুক নয়। কপালে সিঁদূরের ফোঁটা দিয়ে নিলাম, যেন এই সবে কালীঘাট থেকে ফির্ছি। তার পর ধীরে ধীরে ঘড়িওয়ালার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হ'তে আর কতক্ষণ? ঘড়িওয়ালা লোকটার আর যাই থাক্ বুদ্ধি জিনিষটা যে বাশি রাশি নেই তা বোধ হয় প্রথম দিনেই আপনি টের পেয়েছেন। দেড় টাকা দামের ঘড়ি মেলে কিনা সেই প্রশ্ন কর্তে দোকানে উঠে ক্রমে তার সঙ্গে দুনিয়ার গল্প ফেঁদে বস্লাম। গল্পে যখন সে বেশ একটু মজে এসেছে তখন বল্লাম, 'আজ বড়বাজারে এক সাধু একটা মাদুলী দিয়েছে; সাধু বাবার আদেশ কোন ছ'আঙ্গুলে লোককে দিয়ে সে মাদুলী পরাতে হবে; তা আমি কল্কাতায় নয়া লোক, সে রকম ধারা কোন লোকের সন্ধান তো রাখি নে। বাবুজী যদি মেহেরবাণি করে সে রকম কারো নাম বলে দেন তো···।'

"ঘড়িওয়ালা একটু ভ্রূ কুঁচ্কে জবাব দিলে, 'আছে তো বাপু সে রকম আমারই জানা লোক একজন, আমার দোকানে হর্দম্ যাওয়া আসাও আছে তার, কিন্তু সে যে ভদ্দর লোক—তোমার সুবিধে হবে কি সেখানে?' আমি বল্লাম, 'হোক ভদ্দর লোক, গিয়ে পা জড়িয়ে ধর্লেই রাজী

হয়ে যাবে।' লোকটা তখন রাস্তায় নেমে এসে আঙ্গুল দিয়ে প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, 'ওই বাড়ীতে গেলেই পাবে তাকে। নাম বিরূপাক্ষ বাবু—রোজ বারাকপুর থেকে কাজের জন্যে এখানে আসা যাওয়া করেন।'

"ঘড়িওয়ালার কথা শুনে প্রথমটা আমি যে স্তম্ভিত হয়ে গেছ্‌লাম সে কথা অস্বীকার করব না, কিন্তু তার পরেই যেন ধীরে ধীরে আমার চোখের সমুখ থেকে পর্দ্দা খুলে যেতে লাগ্‌ল—বুঝ্‌লাম কেন য়্যাক্‌সিডেণ্টের নাম ক'রে এ ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে ডান হাতটা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ীর দিকে খানিক তাকিয়ে থাক্‌তেই দেখি আপনি বার হয়ে আস্‌ছেন। ঘড়িওয়ালা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে তার দোকানে ফিরে গিয়েছিল। চট্ করে আমার মাথায় একটা ফন্দি চেপে গেল, ভাব্‌লাম বিরূপাক্ষ আচার্য্যের পেছনে লাগ্‌বার আগে আপনাকে দিয়েই আমার ছদ্মবেশটা পরীক্ষা ক'রে নেব—এম্‌নি ভাবে আপনার পেছু নেব যাতে ক'রে আপনার মনে আমার সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে ওঠে। যদি দেখি খুব খুঁটিয়ে দেখার ফলে আপনি আমায় চিনে ফেলেছেন তবে এ বেশ চল্‌বে না, চেহারা আর একটু

বদ্‌লে নিতে হবে। আর যদি চিন্‌তে না পারেন, তা হলে অক্লেশে এ পোষাকেই আমার আসল কাজটা হাসিল কর্‌তে পার্‌ব।

"পোষাক বদ্‌লাবার কিন্তু আর প্রয়োজন হ'ল না। নানা গলি-ঘুঁজি ঘুরে আপনি এগোতে লাগ্‌লেন, ছায়ার মত আমি বরাবর আপনার পেছনে, আপনার মনে বেশ সন্দেহ হ'ল পেছনে কেউ লেগেছে, আড়্‌চোখে বার বার ফিরে ফিরে চাইতে লাগ্‌লেন পর্য্যন্ত, কিন্তু কোন ক্রমেই টের পেলেন না সে কেউটি কে। বাসে গিয়ে আপনি উঠ্‌লেন, ঠিক আপনার সাম্‌নে এমন একটা জায়গায় চেপে বস্‌লাম যাতে আমার সমস্ত মুখটা আপনার নজরে আসে, তবু আপনি ফেল্‌। বুঝ্‌লাম, পোষাক সম্বন্ধে আর ভাবনার কারণ নাই। কিন্তু শুধু নকল পোষাকেই তো কুলোবে না, গলা দিয়ে নকল আওয়াজও যে বার করা চাই। ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী বাজখাঁই গলায় গান ধর্‌লাম। কিন্তু কই, চিন্‌তে পেরেছেন এমন কোন লক্ষণই তো প্রকাশ পেল না—একেবারে ডবল ফেল্‌!

"গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে বাস্‌ থেকে নেমে আপনি লেনের ভেতর ঢুক্‌লেন, আমিও তাই। হঠাৎ দেখি আপনি মাল্‌কোছা মার্‌ছেন! এতদিন এক সঙ্গে বেড়িয়েও কি

মনে করেন বুঝ্‌তে পার্‌লাম্‌ না যে ওভাবে মালকোছা মারার অর্থ আর এক মুহূর্ত্ত পরেই বাঘের মত আমার ঘাড়ের ওপর আপনি লাফিয়ে পড়্‌বেন? কিন্তু নিজের ঘাড়ের ওপর আপনার ঐ মুগুর-ভাঁজা দেহটার ওজন বইতে ঘোরতর আপত্তি থাকায় এবং আপাততঃ নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা যুক্তিযুক্ত বোধ করায় তাড়াতাড়ি আমি রাস্তার পাশে একটা ডাষ্ট্‌বিনের আড়ালে বসে পড়্‌লাম। পর মুহূর্ত্তেই আপনি ফিরে দেখেন ভোজবাজীর মত আমি উড়ে গেছি। দারুণ বিস্ময়ে আপনি সাম্‌নে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খোঁজ কর্‌তে লাগ্‌লেন আমি গেলাম কোথায়, আর সেই ফাঁকে আমিও উল্টো দিকে একটু এগিয়ে ডাইনের গলি ধরে একেবারে বড় রাস্তায়।

—এগার—

"এইবারে বিরূপাক্ষ আচার্য্যের সঙ্গে বোঝাপড়া। সব চাইতে আগে দেখা দরকার, কি জন্যে ও ডান হাতটা কাঠের ফ্রেমে ঢেকে তার ওপর ব্যাণ্ডেজ্‌ বেঁধেছে— অর্থাৎ সত্যিসত্যিই ওর হাত জখম হয়েছে কিনা। যদি প্রমাণ পাই আসলে হাত অক্ষতই আছে তবে স্পষ্টই

বুঝ্‌তে হবে সে দিন রাত্রে আপনাতে আমাতে যে সব কথা হয়েছিল তা সমস্তই ও শুনেছে, এবং পাছে বাড়্‌তি আঙ্গুলটী আমাদের লক্ষ্যে আসে সেই ভয়ে আগে থেকেই সাবধানী হয়ে ন্যাক্‌ড়ার ফালিতে সেটা ঢেকে ফেলেছে। তা হ'লে ও-ই যে চোর সে সম্বন্ধে আব সন্দেহের অবকাশ থাক্‌বে না।

"কিন্তু কি করে জানা যাবে সত্যি সত্যিই কোন য়্যাক্‌সিডেণ্টে হাত ওর ঘাল হয়েছে কিনা! মানুষ আর যাই করুক, ইচ্ছে করে ক্ষিধের সময় খাওয়াটাকে নষ্ট কর্‌তে বড়ই গর্‌রাজী। কাজেই খবরটা জান্‌বার পক্ষে খুবই সুবিধে হয় যদি রাত্রে বাড়ী ফিরে বিরূপাক্ষ আচার্য্য যখন খেতে বস্‌বে কোন ফিকিরে সেই সময়টাতে সেখানে আমি উপস্থিত থাক্‌তে পারি। হাত অক্ষত থাক্‌লে ব্যাণ্ডেজ্ খুলে ও খেতে বস্‌বেই, চাম্‌চে বা অন্য কিছুর সাহায্যে বাঁ হাতেও খেতে যাবে না, বা অপর কারো সাহায্য নিয়ে খাওয়া নষ্ট কর্‌তেও রাজী হবে না। ওদিকে আবার হাতে যে ধরণের ব্যথা হয়েছে বলে ও জাহির করে বেড়াচ্ছে, সত্যি সত্যিই তাই হলে সে হাতে ভাত মেখে খাওয়া অসম্ভব—দেখেন্ নি সামান্য একটু ছোঁয়াচ্ লাগ্‌লেই 'উহুহুঃ' করে উঠ্‌ছিল?

"এই খবরটুকু নিতে পার্‌লেই রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ হয়ে

যায়। আপনাকে গ্রে ষ্ট্রীটের ওখানে হতভম্বের মত ফেলে রেখে তাই আর কালবিলম্ব না করে শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম—উদ্দেশ্য রাত্রে খাবার সময় উপস্থিত হবার আগেই বারাকপুরে আচার্য্য-বাড়ীতে গিয়ে হাজির হব। তারপর একবার ট্রেনে চেপে উঠ্‌লে বারাকপুর পৌছুঁতে আর ক' মিনিট?

"কোন কাজ কর্‌তে গেলেই গোড়াটা আগে ঠিকমত সাম্‌লে চল্‌তে হয়। ধরুন এমন কোন ঘটনাও তো সেখানে ঘট্‌তে পার্‌ত যার ফলে আমায় নিজেকেই গোপন করে ফেলার দরকার হত; কাজেই সে ব্যবস্থাও আগে হতেই ঠিক করে রাখা প্রয়োজন। আপনি জানেন বোধ করি যে চুল-ছাঁটার কাজে আমাদের জাতের লোকেরা ভারী ওস্তাদ্‌। এই কল্‌কাতা সহরে হাল-ফ্যাসানের যত হেয়ার-কাটিং সেলুন আছে সবার সেরা হচ্ছে জাপানী সেলুন—বড় বড় সাহেবরা সব সেখানকার খদ্দের। বারাক্‌পুরের ওপর একটা ক্যান্টন্‌মেণ্ট্‌ রয়েছে, বিস্তর সাহেবসুবোর সেখানে বাস, তাই সেখানেও এক জাপানী গিয়ে চুল-ছাঁটার সেলুন খুলেছে। এ লোকটী আমার খুবই জানাশোনা, স্বজাতি বলে আমায় বড়ই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। ষ্টেশন থেকে 'সেলুন'টাও তার কাছেই;

কি জন্য এসেছি সেটা খুলে না বল্লেও একটু আভাস দিয়ে তাকে জানিয়ে রাখ্‌লাম দুপুর রাত পর্য্যন্ত সে যেন একটু সজাগ থাকে, কেননা যে কোন মুহূর্ত্তেই হয়তো আমি পলাতক হয়ে তার সেলুনে এসে লুকোতে পারি।

"তারপর একটু খোঁজ-খবর নিয়ে সেই হিন্দুস্থানী-বেশেই এই বিরূপাক্ষ আচার্য্যের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম। আপনি চম্‌কাবেন না বিরূপাক্ষ বাবু, পর পর তিন তিনটে মৎলব ঠাওরান ছিল, একটায় না হলে আর একটা ফিকিরে আপনার খাবার ঘরে ঢুক্‌তামই আমি। পাড়ায় খোঁজ নিয়ে আগেই জেনেছিলাম বাড়ীর চাকরটা হিন্দুস্থানী। 'দেশ্‌ওয়ালী' ভাইকে তুষ্ট করার ওষুধটা দৈবক্রমে সঙ্গেই ছিল জানেন—খৈনিপাতা। কিন্তু সামান্য সামান্য ব্যাপারে অসাবধানতা মাঝে মাঝে মানুষকে বড়ই মুস্কিলে ফেলে—কোর্ত্তার পকেটে হাত দিয়ে দেখি বোটানীর অধ্যাপক কখন কোথায় থাকেন সে খবরটা যে কাগজটুকুতে লেখা ছিল কখন অন্যমনস্ক ভাবে সেটা কোর্ত্তার পকেটে রেখেছি। সঙ্গে সঙ্গেই সে ত্রুটীটুকু সেরে ফেলে চাকরকে বাইরে ডেকে আন্‌লাম। ভগবান্‌ প্রসন্ন ছিলেন,—লোকটাকে 'খৈনি' দিয়ে একটু আপ্যায়িত ক'রে চাক্‌রীর কথা পাড়্‌তে সে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা ক'রে

উঠ্‌ল, তাদের বাড়ীর হেঁসেলের ভার বইতে আমি রাজী আছি কিনা। মনে হ'ল হাতে হাতে বুঝি স্বর্গ-ই মিলে গেল; জানালাম, খুব রাজী। একটু বাদেই সে আমায় সঙ্গে করে তার মুনিবের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে যা দেখ্‌লাম তাতে আর এক মুহূর্ত্ত না থেকে সোজা কল্‌কাতা চলে এলেও কোন ক্ষতি হোত না—আমার যা প্রয়োজন তা সে মূহূর্ত্তেই সিদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। কেন? এই আচার্য্য মশাই সেখানে দাঁড়িয়ে ডান হাতে এক ইলেক্‌ট্রিক্‌-ইস্ত্রির সাহায্যে বিপুল চাপে একটা জামা ইস্ত্রি কর্‌ছিলেন—বুড়ো আঙ্গুলের পাশে ক্ষুদে আঙ্গুলটিও বিরাজ কর্‌ছিল। যে হাতে অমন চোট লেগেছে সে হাতে কেউ কখনো ওভাবে ইলেক্‌ট্রিক্‌ ইস্ত্রি ব্যবহার কর্‌তে পারে? বুঝ্‌লাম, সবই ফাঁকি।

"বাড়ীর চাকর তার মুনিবকে বলেছিল আমি কল্‌কাতা থেকে এসেছি; কিন্তু কল্‌কাতা কথাটা না বলাই ভাল মনে করে একটু শুধ্‌রে নিয়ে বল্লাম, বালীগঞ্জে আমার বাস। সেখানকার একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোকের নাম কর্‌লে হয় তো আমার কথায় আরো বিশ্বাস হবে, তাই আরো জানালাম যে মহীন বাবুর বাড়ীতে আমি আগে কাজ কর্‌তাম। মহীন বাবুকে এই বিরূপাক্ষ আচার্য্যের

খুবই চেনার কথা, কেননা প্রোফেসার গুপ্তের কাছে কার্য্যসূত্রে অনেক সময়েই তিনি আসা-যাওয়া করতেন। কোন অশিক্ষিত হিন্দুস্থানীর মুখে একজন বিদ্বান্ লোকের নাম শুনলে সবাই তার কথায় বিশ্বাস ক'রে থাকে।

"আমার যা জানতে আসা তা তো আগেই জানা হয়ে গেছে। তবুও আচার্য্য-বাড়ীর হেঁসেলে ঢুকে কর্ত্তার খাওয়ার সময়টাতে উপস্থিত থাকলাম; দেখলাম অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে তিনি ডান হাতেই ভাত মেখে গলাধঃকরণ করছেন। তারপর রাত একটু গভীর হ'লে বাকী সময়টা আরামে কাটাবার জন্যে পাঁচীল টপকে জাত-ভায়ের সেলুনে এসে উপস্থিত হলাম। সে বেচারা তখন পর্য্যন্ত একটা পোষাক মজুত রেখে আমার জন্যে ঠায় বসে ছিল, যাতে আমি তাড়া খেয়ে দৌড়ে দোকানে এসে ঢুকলে, এক নিমেষে হিন্দুস্থানী থেকে জাপানী বনে যেতে পারি। তারপর কলকাতা এসে যখন পৌঁছালাম তখন পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।"

হুকা-কাশির বর্ণনা শেষ হইলে রণজিৎ স্তব্ধ ভাবে খানিকক্ষণ বুদ্ধির এই অবতারটীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর বলিল, "ধন্য আপনি মিষ্টার হুকা-কাশি! বাস্তবিকই আপনি ধন্য! এর বেশী আর কিছু আমার

মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "কিন্তু একটা কথা তেমন বুঝ্‌তে না পেরে আমার মন বড়ই উস্‌ খুস্‌ করছে—এ লোকটা এক টুক্‌রো রেয়ার আর্থ মেটাল্‌ নিয়ে এত সব কাণ্ড কর্‌ল কেন ? সে জিনিষটাই বা কি, আর এত জায়গা থাক্‌তে এক ঘড়ির দোকানে ঢুকে ঘড়ির ডালার নীচে সেটা পোর্‌বার দরকারই বা কি পড়্‌ল ওর ? ব্যাপারটা তেমন বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

হুকা-কাশি বলিলেন, "না বুঝ্‌তে পার্‌বার কথাই বটে।···আপনি খেয়াল করেছেন কি না জানি না, আমি প্রথমেই এঁকে প্রশ্ন করেছি, 'কি লুকিয়ে রেখেছিলেন ঘড়ির ভেতর, বলুন।' জবাব এল 'এক টুক্‌রো রেয়ার আর্থ মেটাল্‌।' এই একটী জবাব এবং প্রোফেসার গুপ্তের শোচনীয় মানসিক অবস্থা—দুটী জিনিষ মিলে সমস্ত ব্যাপারটা এক নিমেষে আমার কাছে জল করে দিয়েছে, বায়োস্কোপের ছবির মত ঘটনা গুলো পর পর যেন সব আমার চোখের সাম্‌না দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। আমি বলে যাই, আপনি শুনুন।" তারপর বিরূপাক্ষ আচার্য্যের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "আপনিও মন দিয়ে শুনে যান, যেখানে যেখানে ভুল হবে শুধ্‌রে দেবেন।"

"কিছুদিন আগে দুর্গা পূজো উপলক্ষে 'ক্রণিক্লার' নামে খবরের কাগজের একখানা বিশেষ সংখ্যা বার হয়। কাগজের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত নামজাদা লোকের কাছ থেকেই প্রবন্ধ যোগাড় করে ছাপিয়েছিলেন, কাজেই সে সংখ্যা খানা কি রকম উঁচুদরের জিনিষ হয়েছিল তা তো বুঝ্তেই পার্ছেন। ভাল জিনিষ সবাই আগ্রহ করে পড়ে, আমিও একখানা কিনেছিলাম। তাতে প্রোফেসার গুপ্তও একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিয়েছিলেন— 'রেয়ার আর্থ মেটাল্' জিনিষটা যে কি সেটা পড়েই প্রথম আমি তা জান্তে পারি। তিনি লিখেছিলেন, সম্প্রতি রসায়ন শাস্ত্রে এক ধরণের নতুন ধাতু বেরিয়েছে, তার নাম 'রেয়ার আর্থ্ মেটাল'। রেয়ার আর্থ্ মেটাল্ এক রকমের নয়, অনেক রকমের হতে পারে। সব রকমের রেয়ার আর্থ্ মেটাল্ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কারও হয়নি, ভবিষ্যতে হয়তো হবে। পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, এই রেয়ার আর্থ্ মেটাল্ থেকে এমন কতগুলি জিনিষের আবিষ্কার শীগ্গিরই হয়তো সম্ভব হবে, যাতে সারা বিজ্ঞান-জগৎ একটা বড় রকমের নাড়া-চাড়া খেয়ে যাবে। হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি, রেয়ার আর্থ্ মেটালটা অসম্ভব দামী জিনিষ।

"এই পর্য্যন্ত আমার জানা ছিল। তারপর সেদিন বিমল বাবুর মুখে শোনা গেল, অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে প্রোফেসার গুপ্ত সম্প্রতি এক গভীর গবেষণায় মেতে ছিলেন, কিন্তু কি বিষয়ের সে গবেষণা কেউ তা জান্‌তো না। আজ তাঁরই ল্যাবোরেটারী য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ এক টুক্‌রো রেয়ার আর্থ মেটাল চোরের মত লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌ছি এই রেয়ার আর্থ্ মেটালই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়।

"কেন যে প্রোফেসার গুপ্ত তাঁর এই যুগান্তরকারী গবেষণা এত গোপনে গোপনে করে যাচ্ছিলেন তার একটা বেশ বড় রকমের কারণ আছে। আপনার মনে আছে কি না জানি না, একবার তাঁরই আর একটা আবিষ্কার অন্য একজন লোক বেমালুম নিজের নামে পৃথিবীতে চালিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে প্রোফেসার গুপ্ত সাবধান হয়ে গেছেন, সবটা জিনিষ বার কর্‌বার আগে আর তাঁর গবেষণার কথা বাইরে প্রকাশ করেন না।

"অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং সাধনার জোরে ছোট্ট এক কণিকা নতুন রেয়ার আর্থ্ মেটাল আবিষ্কার করে তার থেকে ক্রমে বড় দরের একটা কিছু কর্‌বার চেষ্টায় তিনি ছিলেন। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর এই

গবেষণার বিষয়টী আর একজন লোক টের পেয়ে যায়—ল্যাবোরেটারী-য়্যাসিষ্ট্যান্ট্ বিরূপাক্ষ আচার্য্য।

"এই টের পাবার ফলেই কিন্তু এক অতি জঘন্য মৎলব তার মাথায় এসে ঢুক্‌লো৷ যা কর্‌তে অতি বড় পাষণ্ডেরও বোধ করি বাধ-বাধ ঠেকে ; কিন্তু ল্যাবোরেটারী-য়্যাসিষ্ট্যান্টের তা ঠেক্‌ল না। বহুদিনের অক্লান্ত, হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে প্রোফেসার গুপ্ত যে এক কণিকা নতুন রেয়ার আর্থ্ মেটাল আবিষ্কার করেছেন, যে করেই হোক্ ও সেটুকু সরিয়ে ফেল্‌বে—এই হোল ওর মৎলব। ভেবে দেখুন তা যদি ও কর্‌তে পারে তো কত বড় লাভের সম্ভাবনা ওর! জিনিষটার দামের কথা না হয় ছেড়েই দি, কিছুদিন বাদেই নিজের আবিষ্কার বলে ও সেটাকে চালিয়ে দিতে পার্‌বে, দেশ-দেশান্তরে কতখানি খ্যাতি-প্রতিপত্তি ওর ছড়িয়ে যাবে—চাই কি বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা নাম থেকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ভবিষ্যতের এই রঙ্গীন স্বপ্নে ও ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ভুলে গেল, যাঁর দয়ায় আজ ও লোকসমাজে মাথা তুলে চল্‌তে পার্‌ছে তাঁরই ঘরে বসে, তাঁরই সর্ব্বনাশের ফন্দি-ফিকির খুঁজ্‌তে ও এতটুকু কসুর কর্‌ল না—শুধুই সন্ধানে রইল কি করে সে জিনিষটুকু সরিয়ে ফেল্‌বে। কিন্তু

প্রোফেসার গুপ্ত বড়ই সাবধানী; চা খেতে ওপরে যেতে হলে পর্য্যন্ত নিজের ঘরের দরজাটী বেশ করে বন্ধ ক'রে তবে যান। সুযোগ আর মেলে না।

"এদিকে গবেষণার কাজ তাঁর ক্রমেই এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, সাফল্য-লাভের সময় খুবই কাছিয়ে এল। ফলে তাঁর খাটুনী চারগুণ বেড়ে গেল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের স্ফূর্ত্তিও বেড়ে গেল ঠিক্ আট গুণ। এই কথাই বিমল বাবু বার বার বল্‌ছিলেন, মনে আছে তো? কিন্তু বোধ করি এই অতি বেশী আনন্দের ফলেই এক দিন তিনি এক দারুণ ভুল করে বস্‌লেন,—ওপর থেকে চা খাওয়ার ডাক এলে দরজা বন্ধ না ক'রেই চলে গেলেন। নয় কি?" বলিয়া হুকা-কাশি বিরূপাক্ষ আচার্য্যের দিকে তাকাইলেন।

বিরূপাক্ষের মাথা প্রায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল, সে কোন মতে জবাব দিল, "হুঁ।"

হুকা-কাশি তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এবং ঠিক সেই সময়েই আপনিও এসে সে বাড়ীতে ঢুকেই দেখেন প্রোফেসারের ঘর খোলা। যাঁহা তক্ দেখা, অম্‌নি চট্ করে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর থেকে রেয়ার আর্থ্‌ মেটাল্‌টুকু সরিয়ে ফেলা! নয়?"

বিরূপাক্ষ আচার্য্য এবার আর কোন জবাব দিল না, মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। হুকা-কাশি কিন্তু সেই ভাবেই বলিয়া চলিলেন, "জিনিষটা বার ক'রে এনেই আপনার মনে ধোঁকা লাগ্‌ল কোথায় সেটুকু লুকিয়ে রাখা যায়? নিজের কাছে চোরাই মাল রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। বাড়ীর সব জায়গাই সর্ব্বদা ঝাড়া-পোঁছা হচ্ছে আর তা ছাড়া হাল্‌কা জিনিষ যেখানে সেখানে রাখ্‌লে বাতাসে উড়ে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ বাড়ীতে ঢুকতে আপনাকে কেউ দেখে নি, তাই চট্ করে আপনি অম্‌নি রাস্তায় নেমে পড়্‌লেন। কিন্তু বড়ই মুস্কিল, কোথাও গিয়ে এটাকে লুকিয়ে রেখে আস্‌তে হলে ফির্‌তে ঢের দেরী হয়ে যাবে, হয় তো প্রোফেসার গুপ্তের সন্দেহ আপনার ওপরেই পড়্‌বে। আর তা ছাড়া এমন একটা জিনিষ আপনি পরের কাছে রাখতেই বা যাবেন কি করে? বাড়ীও আপনার কল্‌কাতায় নয়। এই রকম সাত-পাঁচ ভাব্‌তেই হঠাৎ রাস্তার ধারে ঘড়ির দোকানটার ওপর আপনার দৃষ্টি পড়্‌ল—চেনা দোকান বোধ করি, দেখ্‌লেনও যে দোকান-দার একটু আড়ালে গেছে। অম্‌নি তাড়াতাড়ি সেখানে ঢুকে সাম্‌নেই যে ঘড়িটা পেলেন তারই পেছনের ডালার নীচে রেয়ার আর্থ্ মেটাল্

টুকু লুকিয়ে ফেল্‌লেন। ভাব্‌লেন, উপস্থিত তো রইলো এখানে, পরে যে করে হোক্‌ বার করে নেবেন।

"ঘড়ির দোকান থেকে প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ী ফিরেই হয় তো আপনি ভেবেছিলেন দেখ্‌বেন তিনি চা খেয়ে নীচে এসেই রেয়ার আর্থ্‌ মেটাল্‌ টুকু নেই দেখে সমস্ত ল্যাবরেটারী-ময় হৈ চৈ করে তাই খুঁজ্‌তে লেগে গেছেন। কিন্তু তা নয়, আপনার এই চণ্ডালের মত ব্যবহারে তাঁর যে মনে কি দারুণ আঘাত লাগ্‌ল, কতখানি আশা ভঙ্গ হল তার এতটুকু বোঝ্‌বার ক্ষমতা আপনার মত লোকের থাকা সম্ভব নয়। দু'-চার দিনের ভেতরেই যে আবিষ্কারে সমস্ত বিজ্ঞান-জগৎ তোলপাড় হয়ে উঠ্‌বে, এক মুহূর্ত্তে তারই গোড়া ভূমিসাৎ হয়ে গেছে দেখে যে ভীষণ 'শক্‌' তাঁর মনে লাগ্‌ল, এ বৃদ্ধ বয়সে তিনি আর তা সহ্য কর্‌তে পার্‌লেন না, জ্ঞান-হারা হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌লেন। পাষণ্ড আপনি, আপনার জঘন্য কাজে দেশ তার এত বড় প্রিয় সন্তানটীকে হারাতে বসেছিল। কিন্তু সে জন্য এতটুকু অনুতাপ আপনার হয়েছে বলে মনে হয় না, আমাকে শুদ্ধ প্রতারণা কর্‌বার উদ্দেশ্যে একটু আগে বল্‌ছিলেন প্রোফেসার গুপ্তের রহস্যোদ্ধারে আমায় আপনি সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত! তাই বল্‌ছিলাম, আপনার

উপযুক্ত শাস্তি—ঐ” বলিয়া হুকা-কাশি দেওয়ালে টাঙ্গানো বেতখানাকে আর একবার দেখাইয়া দিলেন।

ভাবুক লোকেরা অনেক সময় বলিয়া থাকেন পৃথিবীটা যাতুঘরের মত। বোধ হয় তাঁহারা ভুল বলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই প্রোফেসার গুপ্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন—তাঁহার মানসিক শক্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, বিরূপাক্ষের বিষয় সমস্ত শুনিয়াও তিনি বিমল বা রণজিৎকে তাহার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে দিতে রাজী হইলেন না; বলিলেন, “থাক্ থাক্, ছেলে-মানুষ নিমেষের ভুলে একটা কাজ করে বসেছে, এর জন্যে এর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে আছে কি?” যে পৃথিবীতে বিরূপাক্ষ আচার্য্যের বাস, প্রোফেসার গুপ্তও আবার সেখানকার লোক। তুনিয়া যাতুঘরই বটে।

রণজিৎ এবং বিমল কিন্তু বিরূপাক্ষকে আর প্রোফেসার গুপ্তের সংশ্রবে আসিতে দিল না। পাঞ্জাবে কোথায় তার এক কাকা থাকিত, বিরূপাক্ষ সেখানে চলিয়া গেছে; আজ পর্য্যন্ত আর সে বাংলা দেশে পা দেয় নাই।

—সমাপ্ত—